

Pir Fakir O Kobor Puja Keno Haram

[Internal Link Support Activated, Click on Subjects to go Directly]

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সমাজ আজ যে কষ্ট ও মুসীবাতে জর্জরিত তার প্রধান কারণ হলো, তাদের মাঝে প্রকাশ্য শির্ক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমরা যে আজ ফিতনাহ্ ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, তা আল্ল-হ তা'আলাই মুসলিমদের উপর গযব হিসেবে নাযিল করছেন। তার কারণ হচ্ছে, তারা তাওহীদ বিমুখ হয়ে জঘন্যতম শির্কী কর্মকাণ্ডে ডুবে রয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশের সর্বত্র যে শির্কী কর্মকাণ্ড চলছে পীরপূজা, ফাকীর পূজা, ক্ববরপূজা ও সৃষ্টি পূজা হচ্ছে তার প্রধানতম। এগুলো সম্পর্কে সর্বসাধারণের ব্যাপক ও সঠিক ধারণা না থাকার দরুণ এসব কর্মকাণ্ড দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পীরবাদ মোটেই ইসলাম সম্মত নয়। ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে তার প্রচলন হয়নি। তার উন্মেষই হয়েছে ইসলামের পতন যুগে। পীরবাদীদের কেউ কেউ 'ইল্‌মে তাসাওউফের মাধ্যমে জনগণকে দ্বীন-ইসলামের দিকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু পীরবাদে যে মূল দোষ-ত্রুটি ছিল, তার বীজ রয়েই গেছে এবং তা সৃষ্টি করে রেখেছে একটি বিষবৃক্ষ। বর্তমানে তা-ই এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়ে জনগণকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করছে, বিষাক্ত করছে জনগণের 'আক্বীদাহ ও আ'মালকে।

ব্যক্তি ও সৃষ্টি পূজাকে উৎখাত করে আল্ল-হর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের অনুসারী মুসলিমরা আজ সেসব পরিত্যাজ্য বিষয়গুলোকে সাওয়াবের কাজ মনে করে 'আমাল করে যাচ্ছে, এর চেয়ে আর দুর্ভাগ্যের কী আছে? তাই ঈমান বিধ্বংসী ও সমাজ বিপর্যয়ের কারণ এসব শির্কী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও হানাহানী পরিহার করে শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজ থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালানোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে পীর ফাকীর ও ক্ববর পূজা কেন হারাম? নামক পুস্তক লেখার প্রয়াস পেয়েছি।

এ বই লিখতে যেয়ে যেসব জ্ঞানীগুণীদের বই থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে এবং যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে মহান আল্ল-হ রব্বুল 'আলামীনের দরবারে আমার মরহুম আব্বা মুহাম্মাদ ইদু মিয়া, দাদা- পাঁচু ওস্তাগার, বড় দাদা আব্দুর রহীম বকসসহ দাদী, নানা-নানী এবং সকল মু'মিন মুসলিমদের মাগফিরাত কামনা করছি।

বইটিতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং ইন্‌শা-আল্ল-হ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনে সচেষ্ট হবো।

বিনীত
মুহাম্মাদ আইয়ুব

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

শির্ক ও তার ভয়াবহ পরিণাম

শির্ক অর্থ শারীক বা অংশীদার স্থাপন করা। আল্ল-হ্'র সত্তা ও গুণাবলীর সাথে কোন সৃষ্ট জীবকে সমকক্ষ মনে করার নামই হচ্ছে শির্ক।

যে সব গুণের অধিকারী একমাত্র আল্ল-হ সে সমস্ত গুণ অন্য কারো মাঝে থাকতে পারে এমন মনে করা, যেমনঃ আহারদাতা, মুক্তিদাতা, আরোগ্যদানকারী, ধন-সম্পদ দানকারী, হায়াত-মাওত, লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণের অধিকারী, বিধানদাতা ইত্যাদি ব্যাপারে অন্য কারো কাছে ধর্ণা দেয়া বা অন্য কারো দ্বারা এ সকল কাজ সমাধা হতে পারে মনে করাই হচ্ছে বড় শির্ক। 'ইবাদাতের ব্যাপারে অন্য কারো 'ইবাদাত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

আল্ল-হর সাথে কোন শির্ক কবো না। নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুল্ম। (সূরাহ লুক্বমান আয়াত– ১২)

আল্ল-হ তা'আলা মানুষকে সাবধান করে বলেন ঃ

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

"আল্ল-হ ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ করো না, যারা না পারে তোমাদের উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে। যদি এরূপ কর তবে নিশ্চয়ই তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরাহ ইউনুস আয়াত–১০৬)। এখানে যালিম বলতে মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে।

শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্ল-হ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"নিশ্চয়ই আল্ল-হ শির্কের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া যাবতীয় গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। তবে যে আল্ল-হ্'র সাথে শির্ক (অংশীস্থাপন) করলো সে ঘোরতর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হলো।" (সূরাহ আন-নিসা আয়াত– ১১৬)

তাই আমাদেরকে সর্বাবস্থায় শির্ক থেকে বাঁচতে হবে। যেসব কর্মকাণ্ড দ্বারা শির্ক প্রকাশ পায় তা জানতে হবে এবং এগুলো থেকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। অন্যথায় অনেক 'আমাল করলেও জাহান্নামে যেতে হবে।

পীর মুরীদীর কথা

'পীর' ফারসী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ। আরবী ভাষায় উসতায ও নেতাকে শাইখ বলা হয়। পীর মুরীদী শাস্ত্রে কেউ কেউ এ শাইখ শব্দটাকে পারস্যের অগ্নিপূজকদের পীরের সমার্থবোধক বলে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে বলেছেনঃ খৃষ্টানদের খ্রিষ্ট বলতে যা বুঝায়, হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলতে যা বুঝায় এবং বৌদ্ধদের ভিক্ষু বলতে যা বুঝায় পীর বা পুরোহিত বলতে তাই বুঝায়। এই পীর শব্দ কুরআন ও হাদীসে নেই এবং সহাবা, তাবিঈ, তাবি-তাবিঈনদের অথবা ইমামদের যুগে পীর বা পুরোহিত সমার্থবোধক কোন শব্দ বা পদবীর অস্তিত্ব ছিল না। **মুরীদ শব্দ আরবী যার অর্থ হচ্ছে– কামনাকারী।** তাই এ অর্থ দ্বারা বুঝা যায় এটাই হলো মূল কথা। পীর-মুরীদীর যে প্রথা বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়া আবিষ্কার। এ প্রথা রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না, তিনি কখনো পীর-মুরীদী করেননি। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর, আর না ছিলেন সহাবায়ে কিরাম তাঁর মুরীদ। সাহাবায়ি কিরামও এ পীর-মুরীদী করেননি কখনো। তাঁদের কেউ কারো 'পীর' ছিলেন না এবং কেউ ছিলো না কারো মুরীদ। তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের যুগেও এ পীর-মুরীদীর কোন নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু তা-ই নয়, কুরআন হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ পীর-মুরীদীর কোন দলীল পাওয়া যাবে না। অথচ বর্তমানকালের এক শ্রেণীর লোক এ পীর-মুরীদীকে দ্বীন-ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত জিনিস বলে প্রচারণা চালাচ্ছে।

ভণ্ড পীরেরা কুরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থে মনগড়া কথা বলে মুরীদদের কলবে আল্ল-হকে আবিষ্কার করে, তাওয়াজ্জুহতে পাপিষ্ঠকে নাকি কামিল করে। এই পীরেরা রসূলের মুহাব্বাত পাইয়ে দিয়ে, আল্ল-হর দর্শন করিয়ে দেয়ার মাধ্যম সেজে, আল্ল-হর ওয়ালী সেজে, মুরীদদের পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে যে সব দাবী করছে আসলে তারা ঈমান বিনষ্টকারী এবং শাইত্বনের শাগরেদ। মুরীদগণ এই বিশ্বাসে পীর ধরেন যে, পীরেরা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন; আর পীরেরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে দাবী করেন। পীরেরা বলেন যে, পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া দুষ্কর হবে। তাই এক শ্রেণীর সরল ও অজ্ঞ মানুষ এই ভয়েই পীরের মুরীদ হচ্ছে।

(সূত্রঃ গুরুবাদ বা পীরতত্ত্ব– আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী (রহঃ) ১-১৪ পৃষ্ঠা)

পীরদের উৎপত্তি সূফীবাদ থেকে

'সূফী' শব্দটি সাফ (পবিত্রতা) অথবা সূফ (পশম) অথবা সুফফা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাসাওউফ পন্থীদেরকে সূফী বলা হয়। এরা আধ্যাত্মিকতাবাদীও বটে। এদের গুরুকে পীর নামে অভিহিত করা হয়। (সূফী তত্ত্বের অন্তরালে, অধ্যাপক আব্দুন নূর সালাফী– ১ পৃষ্ঠা) সূফীবাদ মূলতঃ ইরানী দর্শন, বেদান্ত দর্শন, গ্রীক দর্শন,

যরথ্রোষ্ট দর্শন ইত্যাদি থেকে ইসলামে অনু প্রবেশ করেছে। ঐ দর্শনগুলোর জগাখিচুড়ী রূপ হচ্ছে 'সূফীবাদ'। এ সূফীবাদ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করে নাই। কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও এর প্রমাণ নেই (সূফী তত্ত্বের অন্তরালে- ৪৯পৃঃ)। কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াতও এর প্রমাণে পেশ করা সূফীদের সাধ্যাতীত। রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসও এর (সূফীবাদের) প্রমাণে উদ্ধৃত করা যাবে না। রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে আল্লাহর নিকট থেকে যে ওয়াহী/প্রত্যাদেশ এসেছিল, তার একটিকেও গোপন করে আবূ বাক্র (রাযিঃ) ও আলী (রাযিঃ)-কে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দেননি। রসূলে মাক্বূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কুরআনের ও তার ব্যাখ্যার কোন অংশকে জনগণ থেকে প্রচ্ছন্ন রেখে 'আলী (রাযিঃ)-কে শিক্ষা দিয়ে থাকেন– যা সূফীরা দাবী করে– তাহলে আল্ল-হর বিধান فما بلغت رسالته 'ফামা বাল্লাগতা রিসা-লাতাহু' অর্থঃ তা'হলে তুমি তাঁর রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না" (সূরাহ আল-মায়িদাহ আয়াত- ৬৭) এই আয়াতের হুকুম মত তাঁর নাম নাবুওয়াতের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেত; কিন্তু তা হয়নি। যেহেতু তিনি (নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালাতের সামান্য অংশকেও প্রচ্ছন্ন করেননি, জনগণ থেকে লুকিয়ে 'আলী (রাযিঃ)-কে স্বতন্ত্রভাবে গোপনে শিক্ষা দেননি, সেহেতু তাঁর নাবুওয়াতের ও রিসালাতের সামান্যতম ক্ষতি হয়নি। আল্ল-হ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রসূল! তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে ওয়াহীস্বরূপ যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার সবগুলোকে হুবহু (জনগণের কাছে) পৌঁছিয়ে দাও। যদি তুমি তা না কর তাহলে তুমি তাঁর দেয়া রিসালাতের দায়িত্বকেই পৌঁছালে না।"
(সূরাহ আল-মায়িদাহ আয়াত- ৬৭)

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু সূফীদের উক্তিঃ 'দ্বিতীয়টি (বাত্বিনী ইল্ম) অতি গোপনীয় যা মনোনীত সহাবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটাই ইলমে সীনা।" তাদের এ দাবী দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু জিনিসকে গোপন করেছিলেন! নাঊযুবিল্ল-হ্। অথচ তিনি একটি হুকুমকেও গোপন করেননি। করলে তিনি রিসালাতের দায়িত্বই পালন করেননি বলে বুঝাবে। আল্ল-হর বাণী এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। আল্ল-হ তা'আলা অবশ্যই সত্যবাদী, আর বাতিলপন্থীরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

সূফীবাদের ধারাবাহিক ইতিহাস

অধ্যাপক আব্দুন্ নূর সালাফী তার সূফীতত্ত্বের অন্তরালে পুস্তক ৫৪-৫৫ পৃঃ উল্লেখ করেন যে, নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন বাতিলপন্থী সূফীর অস্তিত্ব ছিল না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যক্তি বিশেষের নামের সাথে আল-সূফী উপনাম দেখতে পাওয়া যায়। কূফার শীয়া'আ আল-জাবির ইবনু হাইয়্যান সূফী উপনামে পরিচিত হন। আল্লামা জাহিজ এর মতে উক্ত সময়ে কূফায় আবির্ভূত একটি মরমীবাদী আধা শীয়া'আ গোষ্ঠীর মধ্যে এর ব্যবহার ছিল। নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর ৫০ বছর পর থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত সূফী শব্দ কূফার চতুঃ সীমানাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহূদী আব্দুল্লাহ বিন সাবার ইসলাম গ্রহণের ছদ্মাবরণে ধীরে ধীরে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম জনগণকে ইসলাম থেকে দূরে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন নবোদ্ভূত মতবাদের দিকে ঠেলে দেয়ার ঘৃণ্য ফলশ্রুতি স্বরূপ সূফীবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। এরই ষড়যন্ত্রের ফলে খালীফাহ 'উসমান শাহাদাত বরণ করেন। এরই কারণে শীয়া'আ ও সুন্নীর মতভেদ সৃষ্টি হয়।

সূফীরা বলে বেড়ায় যে, নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে 'আলী (রাযিঃ)-কে অনেক কিছু শিখিয়েছেন যা তিনি অন্যকে শেখাননি। এর কারণেই পরবর্তীতে বাতিলপন্থীদের উৎপত্তি হয়। ৩০ পারা জাহিরী (প্রকাশ্য) আর ৬০ পারা বাতিনি (গোপনীয়) কুরআন সূফী পীরদের সীনায় সীনায় চলে আসে। উল্লিখিত ষড়যন্ত্রের ফলে নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর দু'শ বছর পর থেকে সূফীবাদ অন্যতম তথাকথিত বিশেষ মুসলিম জীবন ব্যবস্থা রূপে স্বীকৃত পন্থীদের কাছে স্বীকৃত হয়ে আসছে। নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত বানানো উপাসনার আনুষ্ঠানিক আচার-পদ্ধতি আবিষ্কার করে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করাই ছিল এঁদের মরমী জীবনের বৈশিষ্ট্য। আল্ল-হর নাবী মুহাম্মদ সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "লা রহবা-নিয়্যাতা ফিল ইসলাম।" অর্থাৎ ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই। (আবূ দাঊদ হাঃ ১৭২৯)

আর এ সূফীপন্থীরা সূফীবাদের নামে সেটাকে ইসলামে আমদানী করেছে। আল্ল-হর নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলী (রাযিঃ)-কে কোন গোপন বিদ্যা শিখাননি এবং 'আলী (রাযিঃ)-এর সাথে হাসান বাসরীর সাক্ষাৎও ঘটেনি। সূফীদের কল্পকাহিনী অনুযায়ী হাসান বাসরী 'আলী (রাযিঃ)-এর কাছ থেকে উক্ত গোপন বিদ্যা শিক্ষা করেন। আসলে 'আলী (রাযিঃ)-এর সাথে হাসান বাসরীর আদৌ সাক্ষাৎ হয়নি। তবে বাসরী সূফীদের প্রধান ছিলেন হাসান আল-বাসরী, আর কূফাবাসীদের সূফীতত্ত্বের উস্তাদ ছিলেন রবী বিন খাইসাম। ক্রমে ক্রমে ২৫০হিঃ/৮৬৪ঈঃ -এর পর বাগদাদ নগরী মরমী আন্দোলনের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। এ বছরেই সর্বপ্রথম ধর্মীয় আলোচনা এবং যিক্‌র আযকারের হালকা অনুষ্ঠানের জন্য মাসজিদগুলিতেও সূফীবাদের উপর আলোচনা এবং বক্তৃতা দানের

সূচনা হয়।' (ইসলামী বিশ্বকোষ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ছাপা ১২ তম খণ্ড ৩৯৬ পৃষ্ঠা) এখানে উল্লেখযোগ্য, যে কাজগুলো ২৫০ হিজরী সনে ইসলামে অনুপ্রবেশ করল, সেগুলো সম্পাদন করলে কি কোন মুসলিম সাওয়াবের আশা পোষণ করতে পারেন? এরা ঢিলা-ঢালা পোষাকের ছদ্মাবরণে ইসলামে বৈরাগ্যবাদের আমদানী করেছে। পীর ফাকীরদের এ বৈরাগ্যবাদ যা সূফীবাদ নামে আখ্যায়িত। এগুলো গ্রীক দর্শন, ইরানীয় দর্শন এবং ভারত বর্ষের রামানুজ থেকে ধার করে নেয়া হয়েছে। এদের মতে, ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন অপেক্ষা মনের সংকল্পটাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। (সূফী তত্ত্বের অন্তরালে ভূমিকা- ১ পৃঃ)

এ নবাবিস্কৃত ও নবোদ্ভূত পদ্ধতিতে ধ্যান-তাপস্যা করতে গিয়ে বায়েজীদ বোস্তামী বলেনঃ "আমার এ পরিধেয় বস্ত্রের নীচে এক আল্ল-হ ভিন্ন আর কিছুই নেই। তিনি আরো বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা আমার, কি মহিমাময় আমার মর্যাদা। নিশ্চয়ই আমিই আল্ল-হ আমি ব্যতীত উপাস্য আর কেউ নেই; সুতরাং আমারই বন্দেগী কর। নাউযুবিল্লাহ।" (ঐ ১৫ পৃঃ) পরবর্তীকালে মানসূর হাল্লাজ 'আনাল হাক্ব' 'আমিই সত্য' বলে আল্ল-হ হবার দাবী করেন। পরবর্তীকালে এদের কয়েকজন সূফী গাউসুল আযম উপাধি ধারণ করেছেন। অর্থাৎ বিপদ আপদের সময় সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা। এই গাউসুল আযম সূফীদের মতে, এ ত্রাণকর্তাই নাকি আল্ল-হর সমস্ত প্রশাসন ক্ষমতা হস্তগত করে রেখেছে। এর আদেশ ছাড়া নাকি পৃথিবীতে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। যাঁরা এরূপ ধ্যান ধারণা পোষণ করেন, প্রকৃত পক্ষে তারা কুরআন ও সুন্নাহকে অস্বীকার করে থাকেন। আবার এসব তপ-যপ পদ্ধতির মাধ্যমে নাকি এরা পরমাত্মার সত্তায় বিলীন হয়ে যেতে পারেন। রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্ল-হর সত্তায় বিলীন হতে পারেননি, কিন্তু ভুঁই ফোড় সূফী আল্ল-হর সত্তায় বিলীন হয়ে গেছেন? (সূফীতত্ত্বের অন্তরাল ভূমিকা ১-২ পৃঃ)

সূফীরা মনে করে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ অপেক্ষা অন্তর দ্বারা আনুগত্য বরণই শ্রেয়। এ কারণেই কুরআন হাদীস বিশারদ পণ্ডিতগণ ও ফাকীহ বিদ্বানগণ এদেরকে কাফিররূপে আখ্যায়িত করেছেন। এরা নিজেদেরকে বাতিনীপন্থী নামেও চিহ্নিত করে থাকেন। এদের কেউ মুরীদানকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেনঃ কুবরে মুনকার নাকীরের সাওয়াল জওয়াবের সময় পীর সাহেব কুবরে ফিরিশতার আকারে যাবেন এবং মুরীদানকে উদ্ধার করবেন। কথিত আছে বরিশাল অঞ্চলের এক পীরের ধারণা ও আক্বীদাহ্ অনুরূপ। আরো কথিত আছে ফরিদপুর অঞ্চলের এক পীরের দরগাহে 'লে খাজা' বলে গরু যবাই করা হয়। (সূফী তত্ত্বের অন্তরালে ভূমিকা- ২ পৃঃ)

এ সূফী তত্ত্বের অন্তরালে যে শিরকের বীজ বপন করা হয়েছে, এগুলো মানলে ও বিশ্বাস করলে কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনানুযায়ী পরকালে নাজাত পাবার আশা একেবারেই নেই।

'সূফীবাদ' জাতীয় পুস্তকে দেখা যায় যে, প্রাথমিক যুগের সূফীগণ আল্ল-হকে ভয়ের বস্তু মনে করতেন। ভীতির আতিশয্যে তারা আল্ল-হর প্রতি প্রেম নিবেদন

করতেও অসমর্থ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেম নিবেদন করাই সূফী তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে। তাদের এ প্রেম নিবেদন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে স্বকপোল কল্পিত। মুহাম্মাদুর রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্ল-হ প্রীতির পদ্ধতির সাথে এর কোনও সাদৃশ্য নেই। যে 'আমাল নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে করা হয়নি, যে 'আমাল রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আমালের সাথে সাদৃশ্য নেই, যে পদ্ধতি রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেননি, সে পদ্ধতি যে অভিনব বিদ'আত তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (সূফী তত্ত্বের অন্তরালে- ৯ পৃঃ)

সহীহুল বুখারী 'বাবু কিতাবিল' ইল্‌ম' অধ্যায়ে আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) সহাবী 'আলী (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করে বলেনঃ 'আপনার কাছে কী কোন লিখিত পুস্তক আছে? উত্তরে তিনি বলেনঃ না। সহীহুল বুখারীর 'জিহাদ ও ভ্রমণ' অধ্যায়ে 'আলী (রাযিঃ)-এর একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

'আলী (রাযিঃ) ইট নির্মিত একটি মিম্বারে আরোহণ পূর্বক বক্তৃতা করেন। তখন তাঁর কাছে একটা তরবারী ছিল। তাতে একটা পত্র সংযুক্ত ছিল। তিনি বলেন– 'আল্ল-হর শপথ করে বলছি, আমাদের কাছে আল্ল-হর কিতাব এবং এ পত্রে যা আছে তাছাড়া পড়ার যোগ্য আর কিছু নেই। অতঃপর তিনি সেটাকে (পত্রটাকে) সম্প্রসারিত করলেন। তাতে লেখা ছিল (যাকাত নেয়ার জন্য) উটের বয়স, আইর থেকে সাওর পর্যন্ত মাদীনাহ পবিত্র ও সম্মানিত। যে কেউ এখানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে তার প্রতি আল্ল-হর মালাইকাদের (ফেরেশতামণ্ডলীর) এবং মানব জাতির অভিসম্পাত। সে পত্রে এটাও লেখা ছিল যে, মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ম এক রকম, যার জন্যে তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তি শ্রম সাধনা করবে। যে কেউ কোন মুসলিমের কৃত অঙ্গীকারকে নস্যাৎ করবে তার প্রতিও আল্ল-হর, মালাইকাদের এবং মানব জাতির অভিসম্পাত। আল্ল-হ অনুরূপ ব্যক্তির কোন বিনিময় গ্রহণ করবেন না। সে পত্রে আরো উল্লেখ ছিল যে, যে সব দাস তাদের মুনীবের আইনসম্মত অনুমতি ছাড়াই অন্যের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তা হলেও তাদের উপর আল্ল-হর, মালাইকাদের ও মানব জাতির অভিসম্পাত। ক্বিয়ামাত দিবসে তার কোন বিনিময় গ্রহণীয় হবে না।" (বুখারী হাঃ ২৯৩৪ ও ২৯৪১)

সহীহুল বুখারী ও আবূ দাউদের হাদীসে গোপন বিদ্যার সামান্যতম সন্ধান ও সংবাদ পাওয়া গেল না। এখানে সিনা-দার সিনায় বিদ্যা প্রাপ্ত হবার কোন সংবাদ নেই। তরবারির খাপে রক্ষিত পত্রখানাতে গোপন বিদ্যার সামান্যতম সংবাদও নেই। এরা শুধু গুজব ছড়িয়ে তিলকে তাল করে এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়, গ্রীক ও ইরানীয় দর্শনকে কেন্দ্র করে উপাসনার একটা নুতন ও অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে 'সূফীবাদ' নামে আখ্যায়িত করেছেন মাত্র। ইসলামে কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত 'ইবাদাতের পন্থা ছাড়া অন্য কোন উপায় অবলম্বন করলে তা 'ইবাদাতরূপে গণ্য হবে না। (সূফী তত্ত্বের অন্তরালে- ১০-১১ পৃঃ)

পীর-ফাকীরদের শরী'আত ও মারিফাতের দোহাই ভ্রান্ত

শারী'আতকে 'ইলুমে জাহির' (প্রকাশ্য জ্ঞান) এবং ত্বরীকৃত বা মারিফাতকে ইল্‌মে বাত্বিন (গোপন জ্ঞান) বলে অবিহিত করে দ্বীন ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর জাহিল ত্বরীকৃত পন্থী বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের আসলই হল ত্বরীকৃত মারিফাত, আর এই হাকীকৃত। এই হাকীকৃত কেউ যদি লাভ করতে পারল, তাহলে তাকে শারী'আত পালন করতে হয় না, সে তো আল্লাহকে পেয়েই গেছে। তাদের মতে শারী'আতের 'আলিম এক, আর মারিফাত বা ত্বরীকৃতের 'আলিম অন্য। এই ত্বরীকৃতের 'আলিমরাই উপমহাদেশে পীর নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এ ধারণা প্রচার করা হয় যে, কেউ যদি শারী'আতের 'আলিম হয় আর সে ত্বরীকৃতের 'ইল্‌ম না জানে- কোন পীরের নিকট মুরীদ না হয়, তবে সে ফাসিক।

এসম্পর্কে মুজাদ্দিদ আলফেসানী শাইখ আহমাদ সরহিন্দীর (রহঃ)-এর মতামত আমরা তুলে ধরবো। কেননা, পাক-ভারতে তিনি একদিকে যেমন তাসাউফ বা 'ইলমে মারিফাতের স্তম্ভ তেমনি আকবারী 'দীনে ইলাহীর' ফিতনাহ ও ইসলাম দুশমনীর সইলাবের মুখে তিনি প্রকৃত দীন-ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী। কাজেই তাসাউফ সম্পর্কে তাঁর মতামতের গুরুত্ব 'আপনি আমি বা অন্য কারো তুলনায় অনেক বেশী। তার মত পেশ করা এজন্যেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, এ দেশের পীরেরা সাধারণত তাঁকেই সব পীরের গোড়া বলে দাবি করে থাকেন। শারী'আত ও মারিফাত পর্যায়ে তিনি তার মাক্তূবাত্'-এ লিখেছেন : কাল ক্বিয়ামাতের দিন শারী'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া শারী'আতের বিধান পালনের উপর নির্ভরশীল। নাবী রসূলগণ- যাঁরা গোটা সৃষ্টিলোকের মাঝে সর্বোত্তম- শারী'আত ক্ববূল করারই দাওয়াত দিয়েছেন। পরকালীন নাযাতের জন্য শারী'আতকেই একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা করেছেন। এ মহামানবদের দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য হল শারী'আতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হল শারী'আতকে চালু করা এবং এর আদেশসমূহের মধ্যে একটি হুকুমকে হলেও জিন্দা করার জন্যে চেষ্টা করা। বিশেষ করে এমন সময়, যখন ইসলামের নাম নিশানা মিটে গেছে, কোটি কোটি টাকা আল্ল-হর পথে খরচ করাও শারী'আতের কোন একটি মাসাআলাকে রিওয়াজ দেয়ার সমান সাওয়াবের কাজ হতে পারে না।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) এ পর্যায়ে আরো একটি প্রশ্নের বিশদ ও স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন :

সাধারণত জাহিল পীর ও তাদের মুরীদেরা প্রচার করে বেড়ায় যে, শারী'আত হচ্ছে দ্বীনের বাইরের দিকে চামড়া, আর আসল মগজ হচ্ছে ত্বরীকৃত বা মারিফাত। একথা বলে যাঁরা শারী'আতের 'আলিম কিন্তু ত্বরীকৃত, মারিফাত ইত্যাদির ধার

ধরেন না, শারী'আতকেই যথেষ্ট মনে করেন- তাঁদের 'ফাসিক' ও বিদ'আতী ইত্যাদি বলে অভিহিত করে তাদের সমালোচনা করে এবং তাঁদের দোষ গেয়ে বেড়ায়। এর জওয়াবে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর- দাঁতভাঙ্গা উত্তর শুনুন। তিনি বলেন : শারী'আতের তিনটি অংশ রয়েছে। 'ইলম (শারী'আতকে জানা), আম'ল (শারী'আত অনুযায়ী কাজ) এবং ইখলাস (নিষ্ঠা)। ত্বরীকৃত ও হাকীকৃত উভয়ই শারী'আতের এই তৃতীয় অংশ ইখলাসের পরিপূরক হিসাবে শারী'আতের খাদিম মাত্র। কিন্তু সকলে এতদূর বুঝতে সক্ষম হয় না। অধিকাংশ জাহিল লোক কল্পনার সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, আর বেহুদা অর্থহীন ও অকাজের কথাবার্তা বলাই যথেষ্ট মনে করে। এ লোকেরা মাহাত্ম্য ও মর্যাদার পূর্ণতা কি বুঝবে, ত্বরীকৃত আর হাকীকৃতই বা এরা কি বুঝবে! এরা শারী'আতকে 'চামড়া' বা বাইরের জিনিস মনে করে বসে আছে, আর হাকীকৃতকে মনে করে নিয়েছে মগজ মূল ও আসল। আসল ব্যাপার কি, তা এরা আদৌ বুঝতে পারছে না। তারা তথাকথিত সূফী লোকদের ও পীরদের বেহুদা অর্থহীন কথাবার্তা নিয়ে অহমিকায় নিমগ্ন রয়েছে ও মারিফাতের "আহওয়াল' ও মাক্বামাত" এর মধ্যে পাগল হয়ে ঘুরে মরছে। আল্ল-হ তা'আলা এ লোকদেরকে সঠিক পথের হিদায়াত দান করুন।

(সূত্রঃ সুন্নাত ও বিদ'আত মাও আঃ রহীম খাইরুন প্রকাশনী ছাপা ১৪২-১৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রখ্যাত ওয়ালী আল্ল-মা জুনাইদ বাগদাদী এ মারিফাত-এর মূল্যহীনতা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ

الْعِلْمُ أَرْفَعُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَأَتَمُّ وَأَكْمَلُ تَسَمَّى اللّٰهُ بِالْعِلْمِ وَلَمْ تَسَمَّى
بِالْمَعْرِفَةِ وَقَالَ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ لَمَّا خَاطَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطَبَهُ بِأَتَمِّ الْأَوْصَافِ وَأَكْمَلِهَا وَأَشْمَلِهَا لِلْخَيْرَاتِ فَقَالَ
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ علما وَلَمْ يَقُلْ فَاعْرِفْ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْرِفُ
الشَّيْءَ وَلَا يُحِيْطُ بِهِ عِلْمًا وَإِذَا عَلِمَهُ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمًا فَقَدْ عَرَفَهُ

(كتاب الميشاة، كتاب الطراسين، صـ ١٩٠)

মারিফাতের তুলনায় 'ইল্‌ম অনেক উন্নত, সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। আল্ল-হ্ নিজে 'ইল্‌ম এর নামে অভিহিত হয়েছে, মারিফাতের নামে নয়। (অর্থাৎ কুরআনে আল্ল-হ عالم، عليم বলা হয়েছে- কিন্তু عارف বা عريف বলা হয়নি। এ নিশ্চয়ই অর্থহীন নয়) আর তিনি বলেছেনঃ যারা 'ইল্‌ম লাভ করেছে, তাদেরই উচ্চ মর্যাদা।

জুনাইদ বাগদাদীর এ কথার সারমর্ম হল এই যে, মারিফাতের চাইতে 'ইলম' বড়। অতএব, আল্ল-হ্‌র মারিফাত নয়, আল্ল-হ্ সম্পর্কে 'ইল্‌ম হাসিল করতে হবে। 'ইলম' হাসিল হলেই 'মারিফাত লাভ হতে পারে। আর যার 'ইল্‌ম নেই, সে মারিফাতও পেতে পারে না। এ 'ইল্‌ম-এর একমাত্র উৎস হল আল্লাহ্‌র কুরআন এবং রসূলের হাদীস। কুরআন হাদীসের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌কে জানতে হবে এবং আল্ল-হ্ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ফলেই মানুষ পারে আল্লাহ্‌কে জানতে ও চিনতে। অন্য কোন উপায়ে নয়।

সূফীদের ভ্রান্ত ধারণার নমুনা

১। তাদের অনেকে ধারণা করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের হাতের মধ্যে। সূফী নামে এক সূফী বলেনঃ 'আমার হাতের মধ্যে জাহান্নামের দরজাগুলো, যেগুলো আমি বন্ধ করে রেখেছি এবং আমার হাতেই জান্নাতুল ফিরদাউস, যার দরজা খুলে রেখেছি। যে আমার যিয়ারতে আসবে তাকে সেখানে বাস করার অনুমতি দেবে।'

২। আবু ইয়াজীদ আল বুস্তামী বলেন, আমি চাই ক্বিয়ামাত যেন ঘটে যায় এবং আমি আমার তাঁবুকে জাহান্নামের উপর স্থাপন করি। তখন তাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে, কেন তা করবেন হে আবু ইয়াজীদ? উত্তরে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, যদি জাহান্নাম আমাদেরকে দেখে তবে অবশ্যই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং সমস্ত সৃষ্টির জন্য আমি রামাত বনে যাব।

৩। তারা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে তা হল দেওয়ান, কুতুব, গাউসদের কথা। তাদের 'আক্বীদাহ হচ্ছে কুতুবরাই দুনইয়ার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যার কথা বলেছে الدباغ। তিনি বলেন, দেওয়ান গারে হেরায় বসেন আর গাউস গুহার বাইরে বসে এবং চারজন কুতুবর তার ডান দিকে বসে। তারা হলেন তার কর্মকর্তা এবং তিনজন তার বাম পার্শ্বে বসে। এক এক জন এক এক মাযহাব থেকে এবং দেওয়ানদের ভাষা হচ্ছে সির-ইয়ানি। যদি এ সমস্ত দেওয়ানরা একত্রিত হয় তখন এই বলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আগামীকাল আবার একই সময়ে একত্রিত হবে। তারা দুনিয়ার জগৎ এবং আসমানের জগৎ সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রন করে। এমনকি আল্ল-হ পাক যে সত্তরটা পর্দা দ্বারা আবৃত আছেন তাও তারা নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ এবং মানুষের চিন্তা ভাবনাকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করে। সূফীদের অনুমতি ছাড়া তাদের কথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না।

৪। তাদের বিকৃত 'আক্বীদার মধ্যে আরো আছে আউলিয়ারা নাবীদের থেকেও উত্তম। (সূত্রঃ তাওহীদ বা একত্ববাদ- শাইখ আহমাদ আব্দুল লতীফ- ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

পীরদের সিলসিলাহ্

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের পুত্র হয় ব্রাহ্মণ, পুরোহিতের পুত্র হয় পুরোহিত। ব্রাহ্মণই পৌরহিত্য করার একমাত্র অধিকারী। কেননা হিন্দু ধর্মমতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হতে উৎপন্ন হয়েছে। সেজন্য ব্রাহ্মণকে বলা হয় বর্ণ শেষ। পাণ্ডিত্য থাক আর না থাক, কিছু যায় আসে না। পৌরহিত্য করাটা হচ্ছে ব্রাহ্মণের বংশগত ব্যাপার। ব্রাহ্মণ মরে গেলে তার ছেলে হয় ব্রাহ্মণ। ছেলে মরে গেলে তার ছেলে, এভাবে বংশানুক্রমে এ পৌরহিত্য চলতেই থাকে।

বলাবাহুল্য, হিন্দু সমাজের মত আমাদের সমাজেও এক শ্রেণী দেখা যায় আর সেটা হচ্ছে এই পীর বংশ। পীর বংশের সবাই পীর, পীর বাবা, পীর মা, পীর দাদা, পীর দাদী, পীর ভাই, পীর বোন ইত্যাদি সবাই পীর। পীরে পীরে সব একাকার। পীর সাহেব মারা গেলে তাঁর ছেলে হয়ে যান গদ্দীনশীন পীর। ঠাকুর বা ব্রাহ্মণের মতোই বংশানুক্রমে পীরগিরি চলতে থাকে।

আল্ল-হর ওয়ালী ও শাইত্বনের ওয়ালী

আল্ল-হ তা'আলা বলেন :

الا إنّ أوْلِيَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

"ওহে! নিশ্চয়ই যারা আল্ল-হ তা'আলার ওয়ালী (প্রিয়বান্দা) তাদের কোন ভয় নেই, আর না হবে তারা পেরেশান। (এরা হচ্ছে) যারা ঈমান এনেছে এবং আল্ল-হকে সর্বদা ভয় করে।" (সূরাহ ইউনুস আয়াত ৬৩)

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, আল্ল-হর ওয়ালী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি মু'মিন মুত্তাক্বী এবং পাপ কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখেন। তিনি সর্বদা তাঁর রবকে এককভাবে ডাকেন এবং তাঁর সাথে কাউকেই শারীক করেন না।

তাই ওয়ালীত্ব বা প্রিয় ভাজন হওয়া সত্য। কিন্তু ওয়ালী তো হবেন ঐ ব্যক্তি যিনি মু'মিন, আল্ল-হর অনুগত এবং একত্ববাদী। এটা সত্য নয় যে ওয়ালী হওয়ার জন্য তার দ্বারা কেরামতি প্রকাশ পাবে। কারণ কুরআন পাকে এ ধরনের কোন শর্তের কথা উল্লেখ নেই। এটা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় যে, কোন ফাসিক্ব কিংবা মুশরিক ব্যক্তি আল্ল-হর প্রিয় পাত্র হতে পারে এবং তার মধ্যে ওলীত্ব প্রকাশ পেতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি মুশরিকদের মত আল্ল-হকে ছেড়ে অন্যের নিকট দু'আ করে, সে কেমন করে আল্ল-হ তা'আলার সম্মানীত ওয়ালী হতে পারে? আর কারামাত বাপ দাদার নিকট থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া কোন বস্তু নয়। বরং এটার সাথে জড়িত ঈমান ও নেক 'আমাল। অনেক সময় দেখা যায়, ভণ্ড ফাকীররা তাদের শরীরের মধ্যে লোহা ইত্যাদি প্রবেশ করাচ্ছে অথবা আগুন গিলে খাচ্ছে। আসলে এগুলো হচ্ছে শাইত্বনের কাজ। শাইত্বন তাদের অভিভাবক আর তারা হচ্ছে শাইত্বনেরই প্রিয়পাত্র। নিজেদেন স্বার্থ হাসিলের জন্য শইত্বনী কারসাজী ও ভেলকীবাজীর ছলে এ ধরনের উদ্ভট কার্যকলাপ প্রদর্শন করে কেরামাতি বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এ সমস্ত কাজ দ্বারা বরং তারা ক্রমান্বয়ে গুমরাহীর অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। আল্ল-হ তা'আলা বলেন :

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"কাফিররা মু'মিনদেরকে বলতো আমাদের পথে চল, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব। কিন্তু তারা তাদের একটুমাত্র বোঝাও বহন করার শক্তি রাখে না, তারা মিথ্যুক।" (সূরাহ আল-আনকাবুত আয়াত- ১২)

হাদীসে উল্লেখ আছে, আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বংশের সকলকে আর বিশেষ করে আপন চাচা 'আব্বাস (রাযিঃ)-কে, আপন ফুফু সফিয়্যাহ (রাযিঃ)-কে ও আপন মেয়ে ফাতিমাত (রাযিঃ)-কে ডেকে বলেছিলেন, তোমরা আল্ল-হর কাছ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর। কেননা তোমাদেরকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন কাজে লাগব না। হে ফাতিমাহ! এখন আমার মাল থেকে যা ইচ্ছে চেয়ে নিতে পার, কিন্তু জেনে রেখ, আল্ল-হর কাছে আমি তোমার কোনই কাজে লাগব না। (মুসলিম হাঃ ৪১১)

তাই যিনি সৃষ্টির সেরা, যিনি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, সেই প্রিয় রসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ক্বিয়ামাতের দিন নিজের মেয়ে ফাতিমাহ (রাযিঃ)-এর দোষক্রটির দায়িত্ব গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহলে কোন সাহসে এক শেণীর পীর ফকীর নামধারীরা ক্বিয়ামাতের মাঠে ভক্তদের পাপের বোঝা বহন করার স্পর্ধা দেখাতে পারে?

পীরদের হিদাইয়াত করার দাবী চরম মিথ্যা ও ভণ্ডামী

পীররা মুরীদদের হিদা'আত করার দাবী করেন। কিন্তু হিদাইয়াত করার শক্তি পীর-ফাকীরদের তো দূরের কথা, আল্ল-হর রসূলও পাননি। এ সম্পর্কে আল্ল-হ তাঁর নাবীকে বলেছেন–

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"হে রসূল! আপনার প্রিয়জন যদি কেউ থাকে, আর তাকে হিদাইয়াত করার একান্ত ইচ্ছা যদি আপনার থাকে, তাহলে আপনি তাকে হিদাইয়াত করতে পারবেন না। বরঞ্চ আল্ল-হ তা'আলাই যাকে চান হিদাইয়াত দান করেন এবং তিনিই সমধিক অবগত কারা হিদাইয়াত প্রাপ্ত হবেন।" (সূরাহ আল-ক্বাসাস আয়াত- ৫৬)

তাই হিদাইয়াত করার দাবী পীরদের চরম মিথ্যা ও ভণ্ডামী।

পীর ফাকীরদের ওয়াসীলাহ্ (মাধ্যম) হবার দাবী ঈমান হরণের ফাঁদ

পীররা ওয়াসীলাহ্ (মাধ্যম) হবার দাবী করে। কিন্তু পীর বা পুরোহিতের অস্তিত্ব ইসলামে নেই। প্রত্যেক মুসলিম স্বয়ং তার পুরোহিত। প্রত্যেক মুসলিমকে মহান আল্ল-হর সাথে সরাসরি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কিন্তু পীর-ফাকীররা কুরআনের "ওয়াবতাগূ ইলাইহিল ওয়াসীলাহ" এর অপব্যাখ্যা করে বলে যে, আল্ল-হ এ আয়াত দ্বারা পীর ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি এ আয়াতাংশ দ্বারা পীর ধরার কথা হয় তাহলে আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর "ওয়াসআল লিয়ালওয়াসীলাতা ইল্লাল্ল-হি" অর্থাৎ আমার জন্য তোমরা আল্ল-হর কাছে ওয়াসীলা চাও কথার মানে কী? তিনি কী এ উক্তি দ্বারা তার জন্য পীর ধরিয়ে দিতে বলেছেন? আবার আযানের দু'আয় আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা দ্বারা আমরা কি মুহাম্মাদ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একজন পীর ধরিয়ে দেয়ার জন্য আল্ল-হকে অনুরোধ করি? নিশ্চয়ই না। ওয়াসীলাহ্ অর্থ হচ্ছে নৈকট্য। আল্ল-হর 'ইবাদাত বন্দেগীর দ্বারাই ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, ওয়াসীলা অর্থ হচ্ছে আল্ল-হর নৈকট্যের নাম। তাফসীরে জালালাইনে এর অর্থ করা হচ্ছে– ইবাদাত বন্দেগীর দ্বারা আল্ল-হর নৈকট্যের নাম ওয়াসীলাহ্। তাফসীরে মাদারিকে ওয়াসীলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– ওয়াসীলা ঐ কাজের না যার দ্বারা আল্ল-হর নৈকট্য লাভ করা যায়। এছাড়াও বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর ইবনু কাসীরে বলা হয়েছে আল্ল-হর নৈকট্যের নাম ওয়াসীলা। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ওয়াসীলাহ শব্দের অর্থ হলো– নৈকট্য। তাই কুরআনের তাফসীরকারকদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। এছাড়াও ক্বামূস নামক বিখ্যাত আভিধানগ্রন্থে বলা হয়েছে বাদশাহ মহান আল্ল-হর নৈকট্যের নাম ওয়াসীলাহ। (সুন্নাত ও বিদ'আত ঐ– ১০৫, ১০৮ পৃষ্ঠা)

মোট কথা অভিধান ও তাফসীরের কিতাব থেকে এ কথাই জানা যায় যে, ওয়াসীলাহ ঐসব 'ইবাদাত ও সৎকর্মের নাম, যা আল্ল-হর নৈকট্য লাভে সহায়ক হয়। আল্লাহকে পেতে হলে সৎকর্ম ও 'ইবাদাত, কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের মাধ্যমেই পেতে হবে। এমন নয় যে, কোন মানুষ মাঝখানে রেখে প্রার্থনা করে পরিশেষে তার কাছেই চাইতে শুরু করে দিবে।

আল্ল-হকে পাওয়ার জন্য রাসূলের অনুসরণে শারী'আত পালন ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাধ্যমের কোন অবকাশই নেই, তার কোন প্রয়োজনও নেই। বান্দার দু'আ আল্ল-হর নিকট সরাসরি পৌঁছে যায়। আল্ল-হ সরাসরিভাবে বান্দার দু'আ ক্ববূল করে থাকেন, সে জন্য তিনি কোন মাধ্যম গ্রহণ করতে বলেননি। দু'আ ক্ববূল হওয়ার জন্য তিনি কোন মাধ্যম গ্রহণের শর্তও আরোপ করেননি। বরং এ পর্যায়ে যাবতীয় বিভ্রান্তি ও ভুল 'আকীদাহ দূর করে দিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"হে নাবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তবে বলে দাও আমি অতি নিকটে। কোন দু'আকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার দু'আর জওয়াব দেই- দু'আ কুবূল করি। অতএব, আমারই বিধানকে মান্য করা তাদের কর্তব্য এবং আমার প্রতিই তাদের ঈমান রাখা উচিত। তাহলে তারা সঠিক পথ লাভ করবে।" (সূরাহ আল-বাকারাহ আয়াত- ১৮৬)

আল্ল-হ্-ই সব দু'আ- প্রার্থনাকারীর দু'আ কুবুল করেন, কেবল তাঁরই নিকট দু'আ করে তাঁরই নিকট থেকে তাঁর জওয়াব পেতে চেষ্টা করা উচিত। এ কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে। আল্ল-হর নিকট কোন মাধ্যম ছাড়া পৌঁছা যায় না বলে বিদ'আতীরা যে ধারণা সৃষ্টি করেছে তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে এ আয়াতে। 'দু'আকারীর দু'আ আমিই কুবুল করি' বলে আল্ল-হ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্ল-হর নিকট দু'আ করতে পারলে আল্ল-হ্ সরাসরিভাবেই তা কুবূল করে থাকেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন ঃ 'রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যেমন মধ্যস্থ ধরা হয়, আল্ল-হ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যে তেমন মধ্যস্থ ধরা হারাম। যারা কাফির, যারা মুশরিক ও যারা বিদ'আতী, তাদের ধারণা রাজা আর প্রজাদের মধ্যে যেমন আড়াল বা ব্যবধান থাকে, ঠিক তেমনি আল্ল-হ্ আর তাঁর বান্দার মধ্যে আড়াল বা ব্যবধান আছে। যারা প্রয়োজনে হিদাইয়াতের ব্যাপারে, রুযি-রোযগারের ব্যাপারে বা অন্যান্য প্রয়োজনে সরাসরি আল্ল-হর কাছে আবেদন জানানোর অধিকার তাদের নেই। কাজেই মাঝে একটা মধ্যস্থের দরকার। এই মধ্যস্থের মাধ্যমেই তাদেরকে প্রার্থনা জানাতে হবে। তারা আরো মনে করে, এই মাধ্যম দ্বারা আল্ল-হ্ তাঁর বান্দাদেরকে হিদাইয়াত করে থাকেন ও রুযি-রোযগার বিতরণ করে থাকেন। অতএব সাধারণ লোক এই মধ্যস্থতাকারীদের কাছে আকূল আবেদন জানাবে আর মধ্যস্থতাকারীরা তাদের আবেদন আল্ল-হর কাছে পৌঁছে দিবে যেমন রাজার পরিষদরা লোকের আবেদন নিবেদন রাজার কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকে। রাজার পরিষদরা রাজার সান্নিধ্য লাভ করার দরুণ তাদের কথা যেমন রাজার কাছে অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি এই পীর ফাকীরের দল মধ্যস্থতাকারীরূপে আল্ল-হর সান্নিধ্য লাভ করেছে বলে তাদের সুপারিশও আল্ল-হর কাছে অত্যাধিক কার্য্যকরী হবে। এইরূপ ধারণা নিয়ে কোন ব্যক্তি কাউকে পীর, মুর্শিদ, গুরু বা পুরোহিত, যে নামেই হোক না কেন, মধ্যস্থতাকারী মান্য করলে সে কাফির ও মুশরিক হয়ে যাবে। তার তাওবাহ্ করা ওয়াজিব।

(হাফেজে সুন্নাহ সূত্রঃ পীরতন্ত্রের আজবলীলা- ৯-১০ পৃঃ)

পীর ফাকীরদের মূর্খতা

সারাদেশে যেখানে সেখানে রকমারী ভণ্ড-পীর ফাকীরের আস্তানা রয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা এদের কাছেই ধর্ণা দিয়ে নষ্ট করছে ঈমান। ঢেলে দিচ্ছে অর্থ। তাই এর চেয়ে লজ্জা কি হতে পারে? পীররা আল্ল-হকে পাওয়ার জন্য মুরীদদেরকে

তাদের নিকট বাই'আত নেয়। পীররা জনগণকে ধোঁকা দিয়ে থাকে যে পীরের হাতে বাই'আত অত্যাবশ্যক। পীরের বাই'আত না করলে সে শাইত্বনের মুরীদ হবে। তারা বলে, যার পীর নাই শাইত্বন হচ্ছে তার পীর। এই বাই'আত অর্থ হচ্ছে, **আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করা বা বেচাকেনা।** মুরীদরা পীরের বাই'আত নেয়ার পর পীরের কথা অন্ধভাবে মানতে থাকে। কেননা তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে বা আনুগত্য করে চলার শপথ নিয়েছে।

আবার অনেক পীরদের ক্বিবলাহ্ বলা হয়। এর মানে কী? ক্বীবলাতো ক্বা'বাহ্ শরীফ যার দিকে ফিরে আমাদের সলাত (নামায) আদায় করতে হয়। কোন সহাবী কী রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ক্বীবলাহ্ বলেছেন? না। তাহলে পীরদের পীর ক্বীবলাহ্ বলা অজ্ঞতা ও চরম অন্যায়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়- ভণ্ড পীর ও সূফীরা নিজেরা যেমন সাধারণত জাহিল (অজ্ঞ) হয়ে থাকে, মুরীদদেরকেও তেমনি জাহিল করে রাখতে চায় এবং তাদের দ্বীন- ইসলাম ও ইসলামী শারী'আত সম্পর্কে কুরআন হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে কখনো তাকিদ দেয় না। এসব তথাকথিত পীর ক্বীবলাহ্রা মুরীদদেরকে মুরাক্বাবাহ্ করতে বলবে, হু-হু করে আল্ল-হর যিক্র করতে বলবে এবং হাজারবার তাদের 'বানানো দরূদ শরীফের ওয়াজীফাহ্' পড়তে বলবে। কিন্তু আল্ল-হর কালাম দ্বীন-ইসলামের মূল উৎস কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে, তার তারজমা ও তাফসীর বুঝতে, হাদীসের জ্ঞান আহরণ করতে এবং আল্ল-হর বাণীর সাথে গভীরভাবে পরিচিত হতে কখনই বলবে না।

পীর ফাকীরদের আজব কীর্তি

এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর ফাকীরের দাবী হলো কুরআন ত্রিশ পারা নয় চল্লিশ পারা। তারা বলে, ত্রিশ পারা মৌলভীদের কাছে আর দশ পারা আমাদের কাছে আছে। ঐ দশ পারার মধ্যেই রয়েছে হাক্বীক্বত (মূল) ও মারিফাতের (গোপনীয়তার) আসল তত্ত্ব। আসল তত্ত্ব আমরা পেয়েছি। মৌলভীরা শুধু ত্রিশ পারা কুরআন নিয়ে কচুরীপানার মত ভেসেই বেড়াচ্ছে। পীর ফাকীরদের মতে চার খালিফাহ (রাযিঃ), 'আয়িশাহ (রাযিঃ), ইমামগণ, সহাবায়ে কিরাম ও উলামায়ে কিরামরা কেউই আসল তত্ত্ব পাননি। একমাত্র তত্ত্ব পেয়েছে এই পীর ফাকীরের দল। এরা আরো বলে যে, ঐ দশ পারা লিখিত নেই। এগুলো খুব গোপন ব্যাপার, তাদের সিনায় সিনায় এগুলো সব চলে আসছে।

এই ভণ্ড পীর ফাকীরদের কল্পিত দশ পারার গুপ্ত তত্ত্ব এত ঘৃণিত, ন্যাক্কারজনক ও সামঞ্জস্যহীন যে, তা বর্ণনা করাও ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু সমাজে অবগতির জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকটি তুলে না ধরে পারছি না।

১) এদের প্রথম কথা হল, ত্রিশ পারা কুরআনে যে 'বিসমিল্লাহ' লেখা আছে, সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা তাদের সিনায় আছে, তা হল 'বীজ্মে আল্ল-হ্'

অর্থাৎ বীর্যের মধ্যে আল্ল-হ (নাউযুবিল্লাহ)। সেজন্য তারা বীর্য বা ধাতুকে নষ্ট করা মহাপাপ বলে মনে করে এবং নিজেদের বীর্য নিজেরা খেয়ে ফেলে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জিলার বিখ্যাত পুঁথি সাহিত্যিক মুনশী ফসিহুদ্দীন তাঁর কিতাবে এদের 'প্রেমভাজা' খাওয়ার কথা লিখেছেন। আটার মধ্যে বীর্যপাত করে সেই আটা দিয়ে রুটি বানিয়ে পীর মুরীদ সকলেই খুশী মনে খায়, তাকেই বলে 'প্রেমভাজা'। এই সব পীরের আখড়ায় কোন লোক গেলে তাকে একটু কিছু খেতেই হবে। খেতে না চাইলে পীর বাবাজী শত অনুরোধ করে হালুয়া হোক, রুটি হোক বা অন্য কিছু হোক, একটু তাকে খাওয়াবেই এবং সেই খাবারে পীর বাবাজীর একটু বীজ থাকবেই। কেননা, গোপন দশ পারায় আছে "বীজমে আল্ল-হ।" (মাওলানা আবু তাদের বর্ধমানী রচিত 'পীরতন্ত্রের আজবলীলা' পুস্তকের ২২ পৃঃ)

২) নদীয়ার প্রখ্যাত পুঁথি সাহিত্যিক তাঁর কিতাবে 'লাল সাধন' বলে আর একটা জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন। সেটাও নাকি পীরদের গোপন দশ পারায় লেখা আছে। মেয়েদের মাসিক রক্তস্রাব হলে সে রক্ত ফেলে দেয়া চলবে না, নাক চোখ বন্ধ করে খেতে হবে- একে বলে 'লাল সাধন'। তাছাড়া অমাবস্যার রাত্রিতে যদি কোন মেয়ের প্রথম মাসিক ঋতুস্রাব হয়, তাহলে ঐ রক্তমাখা ন্যাকড়া একটু করে ছিঁড়ে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে, উক্ত পানি বা পানির শরবত আগত লোকদের খাইয়ে থাকে। শোনা যায়, এতে নাকি আগত লোকের চিত্ত-বিভ্রম ঘটে যায় এবং ঐ ব্যক্তি তার অজ্ঞাতেই নাকি পীরের অন্ধভক্ত হয়ে যায়। (ঐ ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

৩) পীর ফাকীরদের কল্পিত দশ পারার আরও গোপন কথা হচ্ছে, শরীরের কোন জায়গার নখ চুল কাটা যাবে না। চুল দাড়ির জন্য চিরুনী ব্যবহার করতে হবে না। তাতে মাথার চুল জটা হয় হোক, দাড়িতে জটা হয় হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই বরং জটার অধিকারী হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এরা আরও বলে, রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মি'রাজ গিয়েছিলেন, তখন তিনি ক্ষুর, কাঁচি, চিরুনী, নাপিত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন? তিনি কি গা ধুয়েছিলেন? তাহলে গোসলের কি দরকার? নখ চুল কাটার বা চিরুনী দিয়ে চুল দাড়ি আঁচড়াবার কি দরকার? (ঐ ২৩ পৃঃ)

এসব ভণ্ড পীর ফাকীরদের কর্মকাণ্ড কুফরী। আর এদের সম্পর্কে মহিউদ্দিন আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ) তার ফাতহুল গায়িব নামক কিতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- অর্থাৎ শারী'আত যে মা'রিফাত বা হাকীক্বতের সাক্ষ্য দেয় না- সে মা'রিফাত কুফর। আমরা দেখছি, উক্ত ভণ্ড পীরদের কোন কথা বা কোন আচরণকে শারী'আত সমর্থন করে না। শারী'আতের কোন জায়গায় লেখা নেই যে, দশ পারা কুরআন গুপ্তভাবে আছে। ভণ্ড পীরদের দশ পারা কুরআন ও তাদের বক্তব্যগুলি উদ্ভট কল্পনা প্রসূত। প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু যে স্রষ্টার অংশ বিশেষ, মানুষ যে নররূপী নারায়ণ-এ কথা শ্রীমৎ শংকরাচার্য্য বলে

গেছেন। অতএব, যারা 'বীজমে আল্লাহ' বলে থাকে, যারা গুরু নামে আছে সুধা, যিনি গুরু তিনিই আল্ল-হ বলে থাকে, তারা যে আসলে শংকরাচার্য্যের শিষ্য– এতে কোন সন্দেহ নেই– (ঐ-২৬, ২৭ পৃষ্ঠা)। তাই এদেরকে মুসলিম বলে কখনো কি অভিহিত করা যায়?

পীর ফাকীররা কিভাবে কেরামাতি দেখায় ও গায়িব বলে?

ভণ্ডপীর ফাকীররা কখনো কখনো এমন কথা বা কাজ করে দেখায় যা দেখে সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে যায়। যেমন : (১) কারো একটা কিছু হারিয়েছে তা খুঁজে পাচ্ছে না। তখন ভণ্ড-পীর ফাকীরদের কাছে সে লোকটি যেতেই বলে দেয় তোর হারানো অমুক জিনিসটা ওখানে পাবি- একথা শুনে হারানো লোকটি ওখানে যেয়ে দেখে সত্যিই তার জিনিস রয়েছে। (২) কারো বাড়িতে দুষ্ট জ্বিনের উপদ্রব আছে। কিন্তু চেষ্টা তদ্বীর করেও তেমন ফল হল না। তখন সে মনে মনে ভাবলো একবার ঐ পীর ফাকীরদের কাছে গেলে হতো। তাই এদের কাছে যাওয়াতেই অমনি বলে দিল, যার জন্য এসেছিস বুঝতে পারছি– যা আর তোকে কষ্ট দিবে না। সত্যি সত্যিই দেখা গেল, তারপর থেকে আর উৎপাত নেই। (৩) আপনি কী দিয়ে ভাত খেয়েছেন, আপনার বাড়িতে কী আছে, আপনার কেউ মারা গেছেন। ভণ্ড পীর-ফাকীররা কিন্তু এসব দেখেনি। আপনি যেই তাদের কাছে গেলেন অমনি এসব কথা সে বলে দিল।

মোট কথা এ ধরনের বহু কীর্তিকাণ্ড এইসব ভণ্ড পীর-ফাকীররা দেখিয়ে থাকে। আর এসব দেখে শুনে এক শ্রেণীর দুর্বল ঈমানের লোক অন্ধভক্ত হয়ে পীরের পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায়।

ভণ্ড পীর বা ফাকীররা এসব কেরামাতি ও গায়িবী খবর বলে থাকে শাইত্বনের কাছে থেকে শিখে কিংবা নিজেই কিছু ভেলকিবাজি ও প্রতারণা দিয়ে কেরামাতি বের করে। এভাবেই তারা আল্ল-হর ওয়ালী হিসাবে নিজেদেরকে পরিচিত করে। এ সম্পর্কে আল্ল-হ কুরআনে বলেন :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا
سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ

সেদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে, তারপর মালাইকাদের (ফেরেশতাদেরকে) বলা হবে এরাই কি সেই দল যারা তোমাদের পূজা করত? তারা বলবে, আপনি মহান পবিত্র। আপনিই আমাদের পরিচালক, আমরা আপনার দিকেই নিবিষ্ট রয়েছি, তাদের দিকে না, বরং তারা জ্বিনদেরই পূজা করত। তারা বেশীরভাগ তাদের উপরেই ঈমান রাখত। সুতরাং আজকে আর তাদের মধ্যে

কেউ কারো লাভ লোকসানের কিছুমাত্র মালিক নয়। আর আমি সেই যালিমদের বলব, তোমরা সেই জাহান্নামের শাস্তিই ভোগ করতে থাক, যা তোমরা মিথ্যা জানতে।" (সূরাহ সাবা আয়াত ৪০-৪২)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, মানুষ জ্বিনের সাহায্যে লাভ-লোকসান, উপকার ও অপকার করতে পারে। মানুষ জ্বিনদের পূজা করে থাকে ও তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে মেনে নিয়ে বিভিন্ন রকমের কেরামাতি শিখে। তাদের কাছে কিছুটা গায়িবী খবর শুনে নিয়ে মানুষদের শুনায়, যাতে মানুষ তাদেরকে সত্যিকার আল্ল-হ তা'আলার ওয়ালী হিসেবে মেনে নেয় এবং সেই আসল দাতা মহান আল্ল-হকে বাদ দিয়ে তাদের কাছেই প্রার্থনা করে।

আল্ল-হ তা'আলা আরো বলেন ঃ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

"আমি তোমাদেরকে বলে দিব কার উপরে শাইত্বন অবতরণ করে? প্রত্যেক মিথ্যাবাদী গুনাহগারের উপরই শাইত্বন অবতরণ করে, যা কিছু শুনে তাই নিয়ে এসে বলে দেয়, আর সেগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই মিথ্যাবাদী।"

(সূরাহ শু'আরা আয়াত- ২২১-২২৩)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে, যখন আল্ল-হ তা'আলার মালাইকাগণ (ফেরেশতাগণ) আকাশে সেই প্রতিপালক আল্ল-হ তা'আলার নিকট থেকে দুনইয়াতে কখন কী হবে জানতে পারেন এবং একে অপরকে এই খবর বলে থাকেন তখন শাইত্বন অতি গোপনে সে সমস্ত খবর শুনে একশতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে ভণ্ড পীর-ফাকীরদেরকে জানিয়ে দেয়। এই সুযোগে ভণ্ড পীর ফাকীররা সে সব খবর কিছুটা মানুষদের বলে এবং পরে যখন মানুষের কাছে কোন একটি সত্য প্রমাণিত হয়, তখন তারা ঐ সমস্ত ফাকীরদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নেয়।

মহান আল্ল-হ বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

আর সেগুলোকে শাইত্বন মারার যন্ত্র হিসেবে বানিয়েছি। আর তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুনের সাজা তৈরী করেছি।" (সূরাহ মুলক আয়াত- ৫)

অর্থাৎ, আল্ল-হ তা'আলা তারকাগুলো শাইত্বনকে মারার যন্ত্র হিসেবে বানিয়েছেন। কারণ যখন মালাইকারা আকাশের উপর দুনিয়াতে কখন কী হবে সেই নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন তখন শাইত্বন সমস্ত খবর চুপে চুপে শুনতে থাকে। যখনই মালাইকারা শাইত্বনের উপস্থিতি জানতে পারেন তখনই তাদের উপর অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করেন।

আ'য়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, কিছুই নয়, (অর্থাৎ তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, মিথ্যা)। লোকজন বলল, হে আল্ল-হর রসূল! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে যা সত্য হয়ে যায়, তখন রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ কথাটি আল্ল-হর তরফ থেকে পাওয়া। জ্বিন তা তড়িৎ গতিতে শুনে নেয় এবং তার বন্ধু গণকের কানে বলে দেয় অতঃপর গণক ঐ কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে। (বুখারী, মিশকাত হাঃ ৪৩৯১)

যারা গণক অথবা ভবিষ্যদ্বক্তাদের নিকট গিয়ে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তারা মুহাম্মাদ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করল। (আহমাদ, মিশকাত হাঃ ৪৩৯৭)

প্রকৃতপক্ষে এরা শাইত্বনেরই পূজা করছে। এরা শাইত্বনদেরকে আল্ল-হর শারীক বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকেও এ আল্ল-হই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তারা আল্ল-হর সাথে তাঁরই মাখলূক বা সৃষ্টকে কি করে পূজা করছে। যে শাইত্বনকে আল্ল-হ করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন এবং সেই শাইত্বনই আল্ল-হকে বলেছিল– আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করব এবং তাদের বৃথা আশ্বাস প্রদান করবো। অতএব, যে ব্যক্তি আল্ল-হকে ভুলে গিয়ে শাইত্বনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয়ই প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল লাতকে আহ্বান করে যদিও লাত ছিল একজন সৎলোক। তারা তাকে আল্ল-হর ছেলেও বলেনি বরং শুধু আহ্বান করেছিল। তাতেই তারা কাফির হয়ে গেল। তেমনিভাবে যারা জ্বিনদের পূজা করে কাফির হয়েছে তারাও তাদেরকে আল্ল-হর ছেলে বলেনি। আল্ল-হ তা'আলা বলেন–

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ

"এই অজ্ঞ লোকেরা জ্বিনকে আল্ল-হর শারীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ ঐগুলোকে আল্ল-হই সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশত আল্ল-হর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র– মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে।" (সূরাহ আল-আন'আম আয়াত- ১০০)

এ আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পীর-ফাকীরদের গায়িব বলা ও কেরামাতি দেখানো আশ্চর্যের কিছু নয় এবং যারা ঐ সমস্ত কেরামাতি দেখে ও গায়িবী খবর শুনে তাদেরকে সত্যিকার আল্ল-হ তা'আলার ওয়ালী হিসেবে মেনে নেয় তারাই বিপথগামী, পথভ্রষ্ট। তাছাড়া ঐ সমস্ত পীর ফাকীররা শাইত্বনের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম যাদু শিক্ষা করে মানুষের কাছে আল্ল-হ তা'আলার নেক বান্দা হিসেবে পরিচিত হয়।

"ইলমে গায়িব" তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মাজীদে "ইল্‌মে গায়িব" কে আল্ল-হ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলছেন, অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এর উত্তর এই যে, যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ পায় কিন্তু জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেয়া হয়। লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়, 'ইল্‌ম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে। তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভুল হবার ঘটনাও অনেক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে সব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা 'ইল্‌ম্ বটে, কিন্তু "গায়িব" নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। এ ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানিয়ে যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মোটকথা কুরআনের পরিভাষায় যাকে "গায়িব" বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্ল-হ ছাড়া কারো জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে তা প্রকৃত পক্ষে "গায়িব" নয়, যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুণ তাকে "গায়িব" বলেই অভিহিত করা হয়।

পবিত্র কুরআন থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাবার পরও যদি কেউ সন্দেহ করে অথবা সামান্যও বিশ্বাস রাখে যে, নাবী ও ওয়ালীগণ আমাদের সম্পর্কে সমস্ত খবর রাখেন, তাহলে তাকে অবশ্যই মুসলিম বলা যাবে না। কারণ সে সরাসরি কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করছে।

অলৌকিক কিছু দেখে ঈমান নষ্ট করা যাবে না

কোন পীর ফাকীর যদি অতি কৌশলে তার ইন্দ্রজালের আশ্চর্য ভেলকি দেখিয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়, নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যায় আর পা যদি তার না ভিজে কিংবা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথচ একটা পশমও না পুড়ে, এমন আশ্চর্য কর্মকাণ্ড দেখে কি আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, ঈমান-ধর্ম সবকিছু তার পায়ে লুটিয়ে দিব? না, কখনো না। বরং তাকে আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ)-এর মতে কুরআন হাদীস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবো যদি সে কুরআন বা হাদীস বিরোধী কাজ করে তাহলে মনে করতে হবে সে মুহাম্মাদ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত নয় বরং সে ইবলীস শাইত্বনের সাগরিদ বা চেলা।

যিক্‌রের নামে ভণ্ডামী

ভণ্ড পীর-ফাকীরদের ছয় লতীফার যিক্‌র এক নব আবিষ্কার। ইসলামে এর উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। 'উপনিষদের' পাতঞ্জলীতে' কুণ্ডলিনি' আছে, আর ছয় লতীফাকে তার মতোই মনে হয়। যুগে যুগে ওয়ালী দরবেশগণ ইসলামী শারী'আতের অতিরিক্ত' 'মুরাক্বাবাহ মুশাহাদাহ্' (ধ্যান) এবং এ জাতীয় আরও 'আমাল করে থাকলেও তা সব আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়। আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাঁকে এবং তাঁর সহাবাদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন- অন্য কাউকে নয়। অবশ্য যাঁরা আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহাবাদের অনুসরণ করেন তাদের তো অনুসরণ করতেই হবে। ওয়ালী দরবেশদের কোন আচরণ যদি রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহাবাদের অনুসরণের বহির্ভূত হয়, তবে তা অনুসরণ করা যায় না। প্রচলিত পীর-মুরীদী প্রথা যে অতিরিক্ত আচরণ-তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুর ও বাদ্য ইসলামে হারাম। রাগরাগিনীর সুরে হাম্‌দ নাত এমনকি কুরআন তিলাওয়াত করাও জায়িয নেই। ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শারী'আতে সম্পূর্ণ হারাম। অথচ কোন কোন পীর ফাকীরের দরবারে গান বাদ্যকেই 'ইবাদাতের উপকরণ গণ্য করা হয়। এমনকি যিক্‌রের সময় ঢোল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেন এই বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আল্ল-হর যিক্‌র সম্ভব নয়। আল্ল-হর স্মরণের মধ্যেও হারাম উপকরণ ঢোল বাদ্যের ব্যবহার হচ্ছে। প্রশ্ন উঠে, সেখানে মানুষ আল্ল-হর প্রেমে যিক্‌র করে? না ঢোলের আকর্ষণে যিক্‌র করে? **ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ)** বলেন, শুধু আল্ল-হ বলা বা 'হু' বলা তার কোন মূল ভিত্তি নেই। এটা কোন ভাল বা খাস যিক্‌র হতে পারে না- যিক্‌র হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না বরং তার দ্বারাই নানা ধরনের বিদ'আত ও গোমরাহী ছড়ায়- (আল্ল-হ পাকের দাসত্ব-১১৫) অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজনই নেই। রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শিখানো শারী'আত কি যথেষ্ট নয়? তাঁর শিখানো ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী আ'মাল করলে কি আল্ল-হর পছন্দনীয় হওয়া যায় না এবং এতেই কি মুক্তিপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয় না? অথচ এটা সুনিশ্চিত যে, রসূলের দেয়া শারী'আতকে যথেষ্ট মনে না করলে ঈমান থাকতে পারে না।

যিক্‌রের সঠিক নিয়ম

আযান ছাড়া আল্ল-হ যত প্রকার প্রশংসাসূচক শব্দ আছে সবগুলোর উচ্চারণ সাধারণ স্বরেই করতে হবে। খুব জোরে চলবে না। কুরআন ঘোষণা করছে-

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

"সলাতে (নামাযে) চীৎকার করে তিলাওয়াত করো না, আর একেবারে নিম্নস্বরেও তিলাওয়াত করো না। বরং দু'য়ের মাঝামাঝি পথ ধরো।"

(সূরাহ বানী ইসরাঈল আয়াত- ১১০)

সলাতে যা কিছু পড়া হয়, সেগুলো অবশ্যই যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, বিকট চীৎকার করে যিক্‌র করা হারাম।

একদিন আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি টিলার উপর উঠছিলেন। এমন সময় তিনি একটি খচ্চরের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। একজন সহাবা ওই টিলায় উঠে উচ্চৈস্বরে বললেন- "লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার", তখন নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তো কোন বধির এবং অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 'হে জনগণ! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হয়ে খুব জোরে চীৎকার থেকে বিরত হও। জেনে রেখ, তোমরা এমন একজন শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও নিকটবর্তীকে ডাকছো যিনি তোমাদের সাথে আছেন। (বুখারী হাঃ ৫৯৬১)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, অর্থবোধক পূর্ণ বাক্য দ্বারা আল্ল-হকে স্মরণ, আল্ল-হর প্রশংসাব্যাঞ্জক পূর্ণবাক্য নিম্নস্বরে বা সাধারণ স্বরে উচ্চারণ করাকেই যিকর বলে। আর অন্য কোন পন্থায় যা করা হয় বা হবে তা যিকর নয়- বিদআ'ত। যিক্‌রের সঠিক পন্থা সম্পর্কে আল্ল-হ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

"আপনি আপনার প্রভুকে আপনার মনে অত্যন্ত বিনীত ও ভীতভাবে যিক্‌র (স্মরণ) করুন, উচ্চ শব্দে নয়, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" (সূরাহ আল-আ'রাফ আয়াত- ২০৫)

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা তোমাদের প্রভুকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবং গোপনে ডাকতে থাক। নিশ্চয়ই আল্ল-হ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।"

(সূরাহ আল-আ'রাফ আয়াত- ৫৫)

যিক্‌র আমাদেরকে করতে হবে। তবে যিক্‌র কাকে বলে সেটা আগে জানা দরকার। যিক্‌র শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা বা 'ইবাদাত করা।

(মিশকাত ৫ম খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা)

যিক্‌র করা অর্থ আল্ল-হর সঙ্গে মনের যোগ সাধন করা, আল্ল-হর নামের তাসবীহ ও যিক্‌র অর্থবোধক সম্পূর্ণশব্দের দ্বারা করতে হবে।

আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আফযালুয যিকরে লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, ওয়া আফযালুদ দু'আয়ি আলহামদু লিল্লা-হ।" সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হচ্ছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, আর সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে 'আলহামদু লিল্লা-হ।

(ইবনু মাজাহ, মিশকাত ৫ম খণ্ড হাঃ ২১৮৯)

আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' বলবে, সে ব্যক্তিকে আল্ল-হ তা'আলা সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবেন। (বুখারী হাঃ ৫৯৫৫)

আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'টি বাক্য মুখে উচ্চারণ করতে খুব সহজ কিন্তু ওজনের পাল্লায় খুব ভারী, আর রহমানের নিকট খুব প্রিয়, বাক্য দু'টি হচ্ছে "সুবহানাল্ল-হিল আযীম, সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহাম দিহী" (বুখারী হাঃ ৫৯৫৮)

আল্ল-হর নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর যিক্‌র করে, আর যে ব্যক্তি যিক্‌র করে না, তাদের উপমা হচ্ছে, জীবিত ও মৃতের মত। (বুখারী, হাঃ ৫৯৫৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ববর না মাযার!

আরবীতে পরিদর্শন স্থানকে মাযার বলা হয়। যে ক্ববরকে কেন্দ্র করে উরস হয় সেই স্থানটি অজ্ঞ জনগণের কাছে মাযার নামে প্রসিদ্ধ ও বহুল পরিচিত। কুরআনের আয়াতসমূহে ও বিভিন্ন হাদীসে ক্ববর যিয়ারতের কথা আছে কিন্তু সেখানে কোথাও মাযার শব্দ নেই। আর ক্ববরবাসীকে কোন কিছু শুনানোও সম্ভবপর নয়। আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

"যে ব্যক্তি ক্ববরে পড়ে আছে তাকে আপনি শোনাতে পারেন না।" (সূরাহ ফা-ত্বির আয়াত- ২২)

তোমরা ক্ববরকে সামনে রেখে সলাত আদায় করো না এবং ক্ববরের উপর বসো না। (মুসলিম)

আরবীতে 'মাযা-র' শব্দটির শাব্দিক অর্থ যিয়ারতের জায়গাও হয়। কিন্তু কুরআন হাদীসের পরিভাষায় 'মাযার' শব্দটি ক্ববর যিয়ারতের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা পরিদর্শন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই ক্ববরের সঠিক অর্থ মাযার হয় না।

ক্ববর পূজার সূচনা

বেশীর ভাগ মাযার ও এ জাতীয় স্মৃতিসৌধগুলো ফাতিমীদের শাসনামলে ৪০০ হিজরীতে তৈরী হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনু কাসীর তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ কাফির, ফাসিক্ব, পাপিষ্ঠ, ধর্মত্যাগী, বেদ্বীন, মুনাফিক্ব, আল্ল-হ তা'আলার সিফাত অস্বীকারকারী এবং ইসলামের অস্বীকারকারী অগ্নি পূজকদের মতো তারা ছিল কাফির। তাদের যামানায় তারা দেখে যে, মুসল্লীরা মাসজিদ পূর্ণ করে ফেলছে; অথচ তারা সলাত আদায় করতেন না এবং হাজ্জও করতো না। বরং মুসলিমদের উপর হিংসা করত। ফলে তারা চিন্তা করলো মানুষদেরকে মাসজিদ হতে সরিয়ে দেয়ার। এই চিন্তায় তারা মিথ্যা মাযার ও ক্ববরাহ্ বানাতে শুরু করল। লোকদের মধ্যে ঐ ধারণা প্রচার করল যে, ঐ সমস্ত গুলো হোসেন (রাযিঃ) ও জাইনাব (রাযীঃ)-এর ক্ববর। তাদের মধ্যে অনেক উৎসবের ব্যবস্থা করল যাতে মানুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। নিজেদেরকে ফাতিমী নামে আখ্যায়িত করল যাতে মানুষের চোখ হতে নিজেদের ঢেকে রাখতে পারে। অন্য মুসলিমরা তাদের থেকে এই বিদ'আত নিয়েছে যা তাদেরকে শিরকের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে সময় থেকেই ক্ববর পূজার সূচনা হয়। এভাবেই এ রীতি মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

(সূত্রঃ আল-ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ- মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু বাংলায় অনূদিত- ৫৩ পৃঃ)

ক্ববর পূজা ও টাকা আদায়ের ফন্দি

মুসলিম নামধারী একদল লোক ক্ববরকে পাকা করে তাতে পূজার ব্যবস্থা করছে। সেটাকে মাযার নাম দিয়ে সাধারণ জনগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ধূর্ত লোকগুলো মানুষকে শোষণ করে। তারা প্রচার করে যে, মাযারের অভ্যন্তরে শায়িত ব্যক্তি আল্ল-হর ওয়ালী ছিলেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালে মনোবাসনা পূর্ণ হয়। যেমন খাজা মুঈনুদ্দিন (রহঃ)এর মাযারে লিখা আছে 'কেউ ফিরে না খালি হাতে, খাজা বাবার দরবার হতে'। অজ্ঞ এবং নিরীহ মানুষ সে কথা বিশ্বাস করে ক্ববরকে সাজদাহ করে মাযারের ধূলা গায়ে মাখে এবং মাযার পরিচালক তথাকথিত খাদিমদের অকাতরে টাকা পয়সা দিয়ে যাচ্ছে। এই অর্থ দিয়েই খাদিম নামে ধূর্ত লোকগুলো ধনী হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কিছুই করতে পারে না। সাধারণ মানুষ তা জানে না। এমনটি যদি হতো তা হলে, মানুষ দলে দলে রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজায় গিয়ে তাঁর কাছে অনেক কিছু চাইত এবং তিনিও তাদের প্রার্থনানুযায়ী মনের বাসনা পূর্ণ করে দিতেন, তা কিন্তু ভাবনাতীত। কোথায় কেউ তো কোন দিন রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজায় কিছু চাইলো না, আর তিনিও কাউকে কিছু দিলেন না। এমতাবস্থায়, পীর-দরবেশরা ক্ববর থেকে মানুষকে কী দিতে পারবেন? আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ববর পাকা করতেই নিষেধ করেছেন। কোন সহাবা (রাযিঃ)-এর ক্ববরও পাকা করা

হয়নি এবং সে ক্বরে গিয়ে কেউ পূজাও করে না। মাযার পরিচালক এবং মাযার পূজারীরা কি জানে না যে, সহাবাগণের (রাযিঃ)-এর মর্যাদা এত উর্ধ্বে যে, পরবর্তী এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এসব ভণ্ড পীর-দরবেশ ও আউলিয়াগণ কোন একজন সহাবা (রাযিঃ)-এর ঘোড়ার পায়ের নীচের ধূলার সমকক্ষ কখনো হতে পারবে না।

মাযারে টাকা দেয়া নিতান্তই বোকামি। আজকাল পথভ্রষ্ট মানুষগুলো সেই মাযারে নেকীর উদ্দেশ্যে বহু ধন-সম্পদ দিয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ একটুও চিন্তা করে না যে, এ টাকা কোথায় দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে। যদি সে ক্বরবাসীকে নেক ব্যক্তি ভেবে টাকা দিয়ে থাকে তবুও তো কোন লাভ হচ্ছে না। কারণ, তিনি তো দুনইয়া থেকে চলেই গেছেন। তার কাছে আর টাকা পৌঁছে না। সেখানে হয়তো কোন ক্বরই নেই। কিন্তু প্রতারক শ্রেণীর মানুষ ধোঁকা দিয়ে পীর ফকীর, বুযুর্গর বা নেক ব্যক্তির ক্বর বলে চালিয়ে দিচ্ছে। সেখানে অজ্ঞ লোকগুলো প্রায় গিয়ে যিয়ারত করে আসে। যিয়ারতকারী নির্বোধ লোকগুলো এতটুকুও বুঝে না যে, টাকা পয়সা সেই ব্যক্তি পাচ্ছে না, ধোঁকাবাজ অন্য লোক পকেট ভরে চলছে।

নাবী-রসূল ও ওয়ালীদেরও মৃত্যু হয়

আল্ল-হ তা'আলার পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, নাবী হোক আর ওয়ালী হোক সবারই মৃত্যু আছে। যেমন আল্ল-হ তা'আলা রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"আপনার আগেও কোন লোককে চিরস্থায়ী করিনি। সুতরাং আপনি যদি মারা যান তাহলে তারা কি বেঁচে থাকবে? প্রত্যেক জীবনকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" (সূরাহ আল-আম্বিয়া আয়াত- ৩৪-৩৫)

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা তুলে ধরছি- যখন রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যু সংবাদ 'উমার (রাযিঃ) শুনলেন, তখন তাঁর মাথা বিগড়ে গেল আর তিনি তার খোলা তলোয়ার নিয়ে বের হয়ে বলতে লাগলেন, যে বলবে রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন তাকেই আমি হত্যা করব। ভয়ে কেউ 'উমার (রাযিঃ)-এর কাছে যেতে সাহস করেননি। তখন আবূ বাকার (রাযিঃ) বলেছিলেন, "যে মুহাম্মাদের 'ইবাদাত করে সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ অবশ্যই মারা গেছেন, আর যে আল্ল-হ তা'আলার 'ইবাদাত করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্ল-হ তা'আলা চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।" এরপর আয়াত পড়ে শুনালেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ

"মুহাম্মাদ একজন রসূল মাত্র; তাঁর আগে বহু রসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।"

(সূরাহ্ আলে ইমরান আয়াত- ১৪৪)

যারা ধারণা করে থাকে নাবীদের অথবা ওয়ালীদের মৃত্যু নেই, তারা আসলে জীবিত, তাদের জন্য উপরে উল্লেখিত আয়াত ও ঘটনাটিই কি যথেষ্ট নয়?

কাজেই আল্ল-হ তা'আলার পবিত্র ক্বুরআন থেকে দলীল প্রমাণ পাওয়ার পরও কারো এ ধারণা রাখা উচিত হবে না যে, নাবী অথবা নেক ব্যক্তিগণ জীবিত আছেন।

মৃত ব্যক্তি কিছু শুনতে বা করতে পারে না

মৃত ব্যক্তিগণ মানুষের আহ্বান বা প্রার্থনা শুনতে পান কি? না, তারা মানুষের প্রার্থনা শুনতে পান না।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

"মৃত ব্যক্তিকে তুমি কোন কথা, (কোন আহ্বানই) শুনাতে পারবে না।"

(সূরাহ্ আন-নামাল আয়াত- ৮০)

তাই মৃত ব্যক্তি (ক্ববরস্থ) আমাদের কোন কথাই শুনতে পান না। মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আর আশা করা বা তার ক্ববরের পাশে শিরণি বা তাবাররুক বণ্টন করা যে মারাত্মক অন্যায় তা সহজেই বুঝা যায়।

তাছাড়া মৃত ব্যক্তি যে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেন এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার সমস্ত আ'মালই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আ'মাল ব্যতীত। (১) সদাক্বায়ে জারিয়াহ (অর্থাৎ যে সদাক্বাহ্ দ্বারা সদাক্বাহ্ দানকারীর মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যেমন রাস্তাঘাট তৈরী করা, মাসজিদ, মাদ্‌রাসাহ্ প্রভৃতি নির্মাণ করা)। (২) 'ইল্‌ম যার দ্বারা লোকের উপকার হয় (অর্থাৎ দ্বীনী 'ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া)। (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (অর্থাৎ পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে ও তাদের জন্য দান খাইরাত করে।

(সহীহ্ মুসলিম; মিশকাত হাঃ ১৯৩/৬)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর সকল মানুষের সমস্ত কর্মক্ষমতাই বন্ধ হয়ে যায়।

কাজেই পৃথিবীতে জীবিত 'আলিম 'উলামাদের কাছে দু'আ নেয়ার মতো মনে করে মৃত আলিম, মাওলানা, ফাকীর, দরবেশের কাছে দু'আ চাওয়া অন্যায়। আর যদি কেউ মনে করে তারা নিজেরাই আমাদের বিপদে সাহায্য করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই তা বড় শির্ক হবে।

অনেকেরই ধারণা যে, আল্ল-হ তা'আলার ওয়ালীগণের অবশ্যই কান রয়েছে যা দিয়ে তারা শুনতে পায়। তারা সমস্ত খবর রাখে এবং তারা ক্ববরে জীবিত অবস্থায় আছেন। তাদের আরও ধারণা যে, ক্ববরস্থ ওলীগণ তাদের ভাল মন্দে সাহায্য করে থাকেন।

এ সম্পর্কে আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا
أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

"(আল্ল-হকে) বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ধারণা করছ, তাদের ডেকেই দেখ না, তারা তোমাদের দুঃখ কষ্ট মোটেই দূর করতে সক্ষম নয়, আর কোন ক্ষমতাও ওদের নেই। এরা যাদেরকে ডাকছে, তারা নিজেরাই নিজেদের পালনকর্তার দরবারে পৌঁছানোর উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে কে বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পারে আর তাঁরই মেহেরবানী কামনা করছে, তাঁর আযাবকেও ভয় করছে। কথা সত্যি যে আপনার পালনকর্তার আযাব ভয় করার মতই।"
(সূরাহ বানি ইসরাইল আয়াত- ৫৬-৫৭)

আয়াত থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্ববরস্থ ব্যক্তিগণ আমাদের কিছুমাত্র উপকার করতে তো পারেই না বরং আমাদের সম্পর্কে তারা কিছুই অবগত নন।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

"তার চেয়ে বেশী গোমরাহ আর কে-ই বা হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্ল-হকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকছে, সে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না, আর তাদের দু'আ সম্পর্কে তারা খবরও রাখে না।" (সূরাহ আহক্বাফ আয়াত- ৫)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

"যেদিন রসূলগণকে একত্রিত করবেন আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবেন, আমরা কিছুই জানি না। আপনি অবশ্যই গায়িবের কথা ভাল জানেন।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ আয়াত- ১০৯)

এছাড়াও আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"(নাবী বলবেন) আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিনই আমি তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি। তারপরে যখন আমাকে দুন্‌ইয়া থেকে তুলে নিলেন, তখন আপনি (আল্ল-হ) তাদের খোঁজ-খবর রেখেছেন। আপনিই সব কিছুর খবর রাখেন।" (সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্ আয়াত- ১১৭)

যারা মাযারে গিয়ে বলতে থাকে, বাবা পীর সাহেব আমার অমুক আশাটা পূরণ করে দাও, তারা একটুও চিন্তা করে না যে, তাদের এ আবদার ঐ বাবা শুনতে পাচ্ছে কি না!

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ

"যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তবু তারা তোমাদের ডাক শুনবে না।" (সূরাহ্ আল-ফাত্বির আয়াত- ১৪)

উপরোল্লিখিত পবিত্র ক্বুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যুর পর নাবী ও আল্ল-হ তা'আলার ওলীগণ সমস্ত কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। অতএব, মানুষের বিপদে ও মুসীবাতে ক্ববরস্থ ব্যক্তিদের কাছে যে কোন দু'আ ও আবেদন করলে তারা সাহায্য তো করতে পারেনই না, বরং তাদের কাছে যে আবেদন করা হচ্ছে তাও তারা জানেন না, শুনেন না, উপলব্ধি করতেও পারেন না। তাই প্রমাণিত হচ্ছে আল্ল-হ তা'আলাকে বাদ দিয়ে ক্ববরস্থদের ডাকলে কোন লাভ হয় না।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

"আল্ল-হ কি যথেষ্ট নয় তার বান্দার জন্য?" (সূরাহ্ আয্-যুমার আয়াত- ৩৬)

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, যাদের কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করব তারা আমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না। তার পরেও যদি অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, আল্ল-হ তা'আলার সাহায্য যথেষ্ট নয়- নাঊযুবিল্লাহ।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

"হে রসূল! আপনি বলুন, আমি নিজেরও কোন খারাপ কিংবা ভাল করার ক্ষমতার মালিক নয়। আল্ল-হ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।" (সূরাহ্ ইউনুস- ৪৯)

দেখা যায় আজকাল বহু নামধারী মুসলিম যখনই বিপদে পড়ে তখনই মাযারে যায় এবং ঐ দুঃখ দূর করার জন্য মাযারে গিয়ে পশু যবেহ করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে একটু লাভ হলেই নিয়্যাত করে ফেলে- ওমুক মাযারে গিয়ে বাবার

নামে একটি গরু অথবা ছাগল যবেহ করতে হবে। আর যদি তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ঐ যবেহ করাটা পাপ বলে প্রমাণ দেয়া হয় তখন তারা বলে, বেশীর ভাগ মানুষই তো এ কাজ করে চলেছে। যদি সত্যই পাপ হতো, তাহলে ওরসের সময় বাবার নামে পশু যবেহ করার হিড়িক কোন দিনই থাকতো না।

অথচ আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

"যদি তুমি দুন্ইয়ার বেশীরভাগ লোক যা করে তার অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্ল-হর রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করে দিবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে।" (সূরাহ আল-আনআম আয়াত- ১১৬)

অনেকের ধারণা যে, সাধারণ ক্ববরবাসী আমাদের সম্পর্কে না জানলেও নাবী ও রসূলগণ আমাদের সব খবরই রাখেন। কিন্তু আল্ল-হ তা'আলার পবিত্র কুরআন থেকে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে, রসূলগণও আমাদের সম্পর্কে কিছুই অবগত নন।

যারা মাযারে মৃত ক্ববরবাসীর কাছে শাফা'আত লাভের জন্য যায় এবং বলে থাকে, আমরা পাপী আর পাপীর দু'আ আল্ল-হ তা'আলা ক্ববূল করেন না। তাই নেক ব্যক্তি আমাদের জন্য আল্ল-হ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবে। তারা আরও বলে, উকীল ছাড়া যেমন জজের কাছে পৌঁছা যায় না, তেমনি আল্ল-হ তা'আলার নিকট দু'আ পৌঁছাতে হলে উকীল হিসেবে পীর কিংবা মৃত ব্যক্তির কাছে যেতে হবে।

তারা আরো বলে, একটি ছাদের উপর সিঁড়ি ছাড়া যেমন উঠা যায় না, তেমনই সেই উঁচু আকাশের উপরে আল্ল-হ তা'আলার কাছে সিঁড়ি ব্যতিত পৌঁছা যায় না। সিঁড়ি বলতে বুঝাতে চাচ্ছে, সেই নেক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্ল-হ তা'আলার কাছে পৌঁছতে হবে। এ সমস্ত কথা মানুষ নিজের অজ্ঞতা থেকেই বলে থাকে। অথচ তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআন বা হাদীসে কিছুই প্রমাণ নেই। রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁর ক্ববরে গিয়ে তাঁকে উকীল বানিয়ে আল্ল-হ তা'আলার কাছে শাফা'আত করার জন্য বলেননি। যারা মাযার ভক্ত তারা এমনই বলে এবং মনে করে থাকে যে, তারাই সরল সত্য পথে আছে।

এদের সম্পর্কে আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"তারাই সে লোক যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে পণ্ড হয়; অথচ তারা এ ধারণাই পোষণ করে যে, তারা বেশ উত্তম কাজই করে যাচ্ছে।" (সূরাহ কাহফ আয়াত- ১০৪)

যে সব লোক কুফর ও শির্ক-বিদ'আত কিংবা অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে যে, শাইত্বন তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসেবে প্রকাশ করে। যার দরুণ তারা মন-মস্তিষ্কে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত হাক্ব কাজই করছে বলে মনে করে। তারা নিজেদের অন্যায়কে ন্যায় এবং মন্দকে ভাল মনে করতে শুরু করে। এরা বলে, জজ সাহেব আমাদের মত মানুষ। তিনি কিছুমাত্র গায়িবের খবর রাখেন না, তাই উকিল সহিব বিস্তারিত ঘটনা জজ সাহেবের সামনে পেশ করেন এবং জজ সাহেব সেটা শোনার পর চিন্তা ভাবনা করে বিচার করেন।

উকীল এ জন্যই ধরতে হয় যে, জজ সাহেবের কোন ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানা থাকে না। কিন্তু মহান আল্ল-হ তা'আলা তিনি আমাদের সব খবরই রাখেন, এমনকি মানুষ যদি রাত্রির গভীর অন্ধকারেও কোন পাপ করে তবুও আল্ল-হ তা'আলা দেখে থাকেন। মহান আল্ল-হর নিকট কিছুই গোপন নয়, বরং সব কিছুই প্রকাশ্য। পাহাড়ের গোপন গুহায়, নির্জন জঙ্গলে, আকাশের যে কোন প্রান্তে, সমুদ্রের তলদেশে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি বা শক্তি দ্বারা যে কোন কাজ হোক না কেন, দুন্ইয়ার কোন মানুষ সে খবর জানতে না পারলেও সর্বশক্তিমান আল্ল-হ তা'আলা তার সব কিছুরই সঠিক খবর রাখেন।

এ সম্পর্কে আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُوْرِ الْعَالَمِيْنَ

"আল্ল-হ তা'আলার কাছে সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরসমূহের কথা কি জানা নেই?" (সূরাহ আল-আনকাবূত আয়াত- ১০)

রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বিপদেরই সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক যুদ্ধে শত্রুদের মুকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু কখনই এমন বলেননি যে, হে আল্ল-হ! আদাম (আঃ) এর ওয়াসীলায় অথবা কোন নাবীর ওয়াসীলায় আমাদের জয়যুক্ত করে দিন। বাদর যুদ্ধেও মুসলিমগণ সংখ্যায় অল্প ছিলেন। সে সময়ও তারা অন্য কারো কাছে সাহায্য চাননি। বরং সেই মহান আল্ল-হ তা'আলার কাছেই সব সময় সাহায্য চেয়েছেন।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে মু'মিনদের সাহায্য করা।" (সূরাহ আর-রূম আয়াত- ৪৭)

তাছাড়া যেখানে আল্ল-হ তা'আলা নিজে বলেছেন, আমার দায়িত্ব হচ্ছে মু'মিনদের সাহায্য করা, সেখানে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

"হে মানুষেরা একটা উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, খুব ভাল করে শুন। তোমরা আল্ল-হকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকছ কখনই তারা একটা মাছিকে পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলেই একত্রিত হয় এর জন্য। আর যদি কোন মাছি কোন কিছু চুরিও করে তারা সকলে মিলে তার থেকে সেটা উদ্ধার করতে পারবে না। যে চায় এবং যার কাছে চায় উভয়কেই কতই না দুর্বল করা হয়েছে।" (সূরাহ্ আল-হাজ্জ আয়াত- ৭৩)

শাইত্বন মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কখনও তাদের দ্বারা এমন কাজ করায় যা থেকে মানুষ মনে করে আমরা খুব নেকীর কাজই করে যাচ্ছি এবং এতে আল্ল-হ তা'আলা আমাদের উপর খুব বেশী খুশি হচ্ছেন। যেমন অনেকে মাযারে গিয়ে থাকে তার বিপদ দূর করার জন্য, অথবা মালে বারকাত লাভের জন্য। কিন্তু সেই মাযারে সমস্ত মিথ্যাচারী ও বিভ্রান্ত লোকেরই আড্ডা। এদের সম্পর্কে আল্ল-হ বলেন :

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

"যে কেউ মিথ্যাচারী ও বিভ্রান্ত দলের শামিল হবে, তার আপ্যায়ন হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে। আর জাহান্নামেই তাকে পৌঁছতে হবে। একথা অবশ্যই সত্য ও সুনিশ্চিত।" (সূরাহ্ আল-ওয়াক্বিয়াহ্ আয়াত- ৯৩-৯৫)

কাজেই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের উচিত হবে এ আযাবের সম্মুখীন হবার পূর্বেই যাবতীয় শির্ক গুনাহগুলোর জন্য সেই দয়াময় মহান আল্ল-হ তা'আলার দরবারে অন্তর থেকে তাওবাহ্ করা।

যেসব ওয়াসীলাহ্ (মাধ্যম) খোঁজা নিষেধ

১। নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানের ওয়াসীলাহ্ খোঁজা : যেমন বলা, হে আমার প্রতিপালক রসূল সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াসীলায় আমাকে রোগমুক্ত কর। এটা বিদ'আত। কারণ সহাবীরা কেউ এটা করেননি। আর যে হাদীসে বলা হয় "আমাকে ওয়াসীলাহ্ করে দু'আ কর।" সেটা মূলতঃ হাদীসই নয়। যা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন। আর এই বিদ'আতী ওয়াসীলাহ্ মানুষকে শির্ক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, যখন এ ধারণা করা হয় যে, আল্ল-হ তা'আলা কোন মাধ্যম ছাড়া করতে পারেন না। যেমন আমীর ও বিচারকগণের বেলায় প্রযোজ্য। তাই এতে আল্ল-হকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। আলাই তানবীরে'র মধ্যে তাতারখানীয়ার ঐ বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন : আমি আল্ল-হ ছাড়া অন্যের ওয়াসীলাহ্ করে আল্ল-হর কাছে চাওয়াকে অপছন্দ করি।

২। নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দু'আ করা : তাঁর মৃত্যুর পর যেমন বলা হয়, হে রসূল সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্যে দু'আ করুন এটা জায়িয নয়। কারণ আমার আহ্বান সম্পর্কে রসূল সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত নন। সহাবীরা কেউ এরূপ করেননি। তাছাড়া আল্ল-হর নাবী সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যখন মানুষ মারা যায় তখন তার 'আমালনামা তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া বন্ধ হয়ে যায়– সদাক্বায়ে জারীয়াহ্ করে থাকলে এবং ঐ উপকারী ইল্‌ম যা সে শিখিয়েছে এবং নেক সন্তান যে পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে"। (মুসলিম; মিশকাত হাঃ ১৯৩/৬)

এই সমস্ত 'আমালগুলোর সাওয়াব সে ক্ববরেও পেতে থাকে।

৩। মৃতদের মধ্যে ওয়াসীলাহ্ খোঁজা : তাদের কাছে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া, সাহায্য চাওয়া যেটা আজ দেখা যাচ্ছে। একে মানুষ ওয়াসীলাহ্ মনে করে, মূলে কিন্তু তা নয়। কারণ ওয়াসীলাহ অর্থ হল আল্ল-হর নিকটবর্তী হওয়া; যা ঈমানের দ্বারা এবং নেক কাজের দ্বারা সম্ভব। অন্যদিকে মৃতদের কাছে দু'আ করা আল্ল-হ হতে মুখ ফিরানোর নামান্তর। এটা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্ল-হ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

"আল্ল-হ ব্যতীত এমন অন্যের কাছে দু'আ করো না যারা না পারে তোমার উপকার করতে, আর না পারে তোমার ক্ষতি করতে। যদি তা কর তবে নিশ্চয়ই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরাহ ইউনুস আয়াত– ১০৬)

৪। শারী'আত সম্মত ওয়াসীলাহ : ক্বুরআন সুন্নাহতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে শারী'আত সম্মত ওয়াসীলাহকে তিন ভাগে সীমাবদ্ধ পাওয়া যায়– (১) আল্ল-হর নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলাহ্। (২) সৎ আ'মালের ওয়াসীলাহ্ ও (৩) সৎ ব্যক্তির (জীবিত) দু'আর ওয়াসীলাহ্। ([illegible] ১ পৃঃ)

আল্ল-হ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত হারাম

প্রায়ই দেখা যায়, মাযার ভক্তরা বিভিন্ন মাযারগুলোতে মোরগ, খাসী, গরু, উট, মুরগী, বকরী প্রভৃতি জন্তু মানত করে এবং এগুলো সেখানে যবেহ করে ও ভক্ত মুরীদ মিসকীন– মুসাফিরদের মধ্যে তা বিলি করে। তাই আমাদের জানা দরকার যে, ইসলামে মানতের গুরুত্ব কি এবং মাযারে তা যবেহ করার হুকুম ইসলামে আছে কি না?

বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বলেন : রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মানত করো না। কারণ, মানত ভাগ্য থেকে কোন জিনিসকেই বেপরোয়া করতে পারে না। এমতাবস্থায় তার (মানত) দ্বারা কৃপণ ব্যক্তি থেকে কেবলমাত্রই কিছু বের করে নেয়া হয়।

(বুখারী হাঃ ৬২২৬, ৬২২৭)

তাই মানত করা উচিত নয়। তবুও কেউ যদি মানত করে ফেলে তাহলে তার জন্য 'আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্ল-হর আনুগত্য করার জন্য মানত করবে সে যেন তাঁর (আল্ল-হর) অনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হবার মানত করে সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে। (বুখারী হাঃ ৬২২৯)

আল-কুরআনের সূরাহ হাজ্জের ২৯ নং আয়াতে আল্ল-হ তা'আলা বলেন : তাদের উচিত তাদের মানত পূরণ করা। 'হানাফী ফিকহে' আছে মানত করা আল্ল-হর 'ইবাদাত। (দুররে মুখতার ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা)

তাই আল্ল-হ ছাড়া কোন পীরের খানকায়, মৃত ওয়ালীর মাযারে, কোন দরবেশের দরগায় কোন কিছু মানত করা উক্ত ফিকহে- হানাফীর ফাতাওয়া অনুসারেও শির্ক হয়। বিভিন্ন মাযারে হালুয়া ও মিষ্টি, বাতি, চাদর প্রভৃতি দেয়ার মানত করা শির্কের মধ্যে গণ্য হবে।

ম হানাফী ফিক্‌হি দুররে মুখতারে আছে, তুমি জেনে রাখ যে, অধিকাংশ জনগণের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তিদের জন্য যে মানত করা হয় এবং মাননীয় ওয়ালীদের ক্ববরে যে সব টাকা পয়সা এবং মোমবাতি ও তেল প্রভৃতি দেওয়া হয়ে থাকে তাদের নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে সে সব কাজ সবারই মতে বাতিল ও হারাম। (দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)

ম মাক্কাহ্ দারুল হাদীসের শিক্ষক মুহাম্মাদ বিন জামীল বলেন : ঐ সমস্ত নযর নেয়ায (মানত) যা মৃতদের জন্য পেশ করা হয় তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যে নযর (মানত) দেয় এবং নেয় উভয়ই এই পাপে শারীক হবে। (বাংলা অনুবাদকৃত মুক্তি প্রাঙ্গনদের পাথেয়- ৫৪ পৃষ্ঠা)

ম বিশিষ্ট সহাবী সালমান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি একটি মাছির ঘটনায় জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আর এক ব্যক্তি একটি মাছির ঘটনায় জাহান্নামে প্রবেশ করে। সহাবীরা বলেন, তা কিভাবে? রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের মধ্যে দু'জন লোক এমন কিছু লোকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যাদের কাছে একটি মূর্তি ছিল। তাদের পাশ দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করছিল সেই তাদের মূর্তির জন্য মানত পেশ করছিল। অতএব তারা একজন লোককে বললো, তুমি কোন জিনিস (এ মূর্তির নামে) মানত কর। লোকটি বললো, আমার কাছে কোন জিনিস নেই। তারা বললো, তুমি একটি মাছি মানত কর। তাই সে একটি মাছি কুরবানী দিল এবং সেখান থেকে চলে গেল। অতঃপর ঐ লোক জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবার তারা অন্য লোকটিকে বললো, আপনিও কোন জিনিস কুরবানী দিন। সে বললো, আমি আল্ল-হকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য মানত করি না। তাই তারা তাকে খুন করে ফেললো। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করলো। (মুস. .দ আহমাদ, হিলয়াতুল আউলিয়াহ ১ম খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠা; সূত্রঃ পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার অধ্যাপক মাওঃ হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী, আহলে হাদীস লাইব্রেরী ছাপা ঢাকা- ২৮ পৃষ্ঠা)

হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মাছির মতো একটি তুচ্ছ জিনিসও আল্ল-হ ছাড়া অন্যের জন্য মানত করা শির্ক। যার পরিণাম জাহান্নাম।

একথা বলা হয় যে, যবহের সময় আল্ল-হর নাম নিলে যবেহকৃত জন্তুটি হালাল ও পাক হয়ে যায় যদিও জনগণের নিয়্যাত খারাপ থাকে। তাদের এরূপ ধারণা ভুল। কারণ, আল্ল-হ ছাড়া অন্যের সম্মানার্থে যবেহকৃত জানোয়ার মৃত পশু হয়ে যায়। যদিও তাতে কেবলমাত্র আল্ল-হরই নাম নেয়া হয়।

(দুররে মুখতার, উর্দু তারজামা গ-ইয়াতুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ১৭৯ পৃষ্ঠা)

ম আল্লামাহ্ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন: যে জন্তুগুলো আল্ল-হ ছাড়া অন্যের (মানতের) উদ্দেশ্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা শুকরের চেয়েও জঘন্য এবং মৃত জন্তু। (মাযা-হিরে হাক্ব ৩য় খণ্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা; মুরতাদের বিবরণ, সূত্রঃ পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার- ২৯ পৃষ্ঠা)

ক্ববর পাকা করা যাবে না, পাকা ক্ববর ভেঙ্গে ফেলতে হবে

১) আবূ হাইয়াজুল আসাদী বলেন, আমাকে আলী (রাযিঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাব না যে কাজে রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে, কোন (জীবের) প্রতিকৃতি বা ছবি দেখলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ না করে ছাড়বে না। আর কোন উঁচু ক্ববর দেখলে তাও সমান না করে ছাড়বে না।

২) জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, ক্ববরের উপর বসতে ও ক্ববরের উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম হাঃ ২১১৭)

৩) আবূ মারসাদ গানাভী (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করো না এবং ওর উপরে বসবেও না। (মুসলিম হাঃ ২১২৩)

৪) ইমাম শাফিঈ (মৃত্যু ২০৪ হিজরী) বলেন, তাঁর যুগে ইসলামী শাসকগণ পাকা ক্ববরগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেন। তখনকার ফিকহবিদ 'আলিমগণ তাতে কোনরূপ আপত্তি করতেন না। (কিতাবুল উম্ম ১ম খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত হানাফী মুহাদীস আল্লামা আলাউদ্দিন (মৃত্যু ৭৪৫ হিজরী) বলেন, পাকা ক্ববরগুলোকে ভেঙ্গে অন্য সাধারণ ক্ববরের মতো করে দিতে হবে।

(আল-জাওয়াহারুন নাক্বী আলাল বাইহাক্বী ৪র্থ খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠা)

৫) 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার মাক্কী শাফিঈ (রহঃ) (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরী) বলেন, পাকা ক্ববর (মাযার) ও তার উপরে তৈরীকৃত গম্বুজ ও মিনারগুলো ভেঙ্গে ফেলাতে তাড়াতাড়ি করা ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য। কারণ এইরূপ পাকা ক্ববরগুলো মাসজিদে যিরারের আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং অন্য উদ্দেশ্যে তৈরী করা মাসজিদের চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক। তা এই জন্য যে, ঐগুলো রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমানে 'ক্ববর পাকা নিষেধ' এর বিরোধিতায় তৈরী করা হয়েছে। (আয্‌যাওয়াযির ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)

৬) 'আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, গোরস্তানের পাকা ক্বর ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব। যদিও তা মাসজিদে হোক না কেন (মিরক্বাত ২য় খঃ ৩৭২পৃঃ)

বিখ্যাত মুফাস্‌সিরে ক্বুরআন 'আল্লামা সাইয়্যিদ মাহমুদ আলূসী হানাফী (রহঃ) (মৃত্যু ১২৭০ হিজরী) বলেন, সর্বসম্মত মতে সবচেয়ে বড় হারাম কাজ ও শির্কের কারণাবলীর মধ্যে গণ্য এগুলো– ক্ববরের কাছে সলাত আদায় করা এবং তাকে ঘিরে মাসজিদ বানিয়ে নেয়া কিংবা ক্ববরের উপরে ঘর তৈরী করা। এমতাবস্থায় অপরিহার্য কাজ হল ঐ পাকা ক্ববরকে ভেঙ্গে দেয়া। কারণ, এগুলো রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমানের বিরোধিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ক্ববরের জন্য কিছু ওয়াক্‌ফ করা এবং মানত করাও অবৈধ। (তাফসীর রুহুল মা'আনী ৫ম খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠা)

৭) 'আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) (মৃত্যু ৭৫১ হিজরী) বলেন, পাকা ক্ববরকে ছেড়ে দেয়া বৈধ নয় এবং ওকে ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য। (যাদুল মা'আদ ফী হাদ্‌য়ি খাইরিল ইবাদ)

উপরে বর্ণিত হাদীস এবং বিভিন্ন মাযহাবের বরেণ্য 'আলিমদের ফাতাওয়ার আলোকে কোন ক্ববরকে এক বিঘতের বেশী উঁচু করলে এবং তাকে কুঁজের মত বানালে মুহাম্মাদ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তাকে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসকে কী অস্বীকার করা হয় না কি? অতএব কেউ যদি দুনইয়াবী ধান্দাতে ক্বুরআন ও হাদীসকে জেনে-শুনে অস্বীকার করে তাহলে তার ঈমান ঠিক থাকবে কি? কেউ যদি ভুল করে কিংবা কারো চক্রে পড়ে কোন বুযুর্গের বিরাণ ক্ববরকে মাটি দিয়ে এক বিঘতের বেশী উঁচু করে ফেলে কিংবা সিমেন্ট ও মার্বেল পাথর দিয়ে ওটাকে চাকচিক্যময় মাযারে পরিণত করে ফেলে তাহলে রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বোক্ত ঘোষণা অনুসারে ঐ মাযারটিকে যমীন সমান করার ব্যাপারে তিনি একটুও কি চিন্তা-ভাবনা করবেন না? বর্তমানে যেসব পাকা ক্ববরে (মাযারে) শির্ক ও বিদ'আত হয় না– 'আল্ল-হ না করুন' দু-চারশো বছর পরে সেখানে যদি সাজদাহ্ দেয়ার মত শির্ক ও বিভিন্ন পাপের প্রচলন হয়ে যায় তাহলে সরল মনে ঐ পাকা ক্ববর তৈরীকারীগণ সেই সমস্ত শির্ক ও বিদ'আতের এবং গর্হিত পাপাচারের কি ভাগীদার হবে না? আল্ল-হ সবাইকে বুঝবার (সু-জ্ঞান) তাওফিক দিন– আমীন। (সূত্রঃ পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার –ঐ)

খাজাবাবার ডেগ

আরবী রজব মাসে সারা দেশে বিশেষ করে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে যেখানে সেখানে খাজা বাবার নামে ডেগ বসানো হয়। সন্ধ্যার পর শুরু হয় এগুলোতে গানের আসর। মারিফাতি গানের নামে শির্কী গানসহ রকমারী চটুল গান বাজিয়ে খাজা বাবার নামে পয়সা কালেকশন করা হয়। এ দেশের একশ্রেণীর সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিও এমন যে, ঘুমের ব্যাঘাত হলেও ভয়ে কিছু বলে না।

তারা মনে করে এটা ধর্মীয় ব্যাপার। মাস্তানরা যেমন ছোরা দেখিয়ে চাঁদা চায়, হাইজ্যাকাররা সুযোগ বুঝে যেমন হাইজ্যাক করে, তেমনই অনেক জায়গায় ধর্মের নামে গাড়ী থামিয়ে বিভিন্নভাবে বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করা হয়। রাস্তার পাশে লাল সালু ডেগ বসিয়ে যারা টাকা কালেকশন করে তারা ঐ টাকা কত আজেবাজে কাজে খরচ করে তা সবাই জানে। অনেক সময় গাড়ির পথ বন্ধ করে দাঁড়ায়, আর বলে চাঁদা দিয়ে যাও নয়তো খাজার অভিশাপ লাগবে ইত্যাদি। এদের আকুতি মিনতির কাছে অনেক মানুষই পরাজিত হয়ে শির্কী কাজে টাকা দিয়ে দেয়; কিন্তু চিন্তা করে না কিসে এবং কেন দিলাম। এ মৃত ব্যক্তিরই বা কি উপকার হবে। খাজা বাবার নামকে পুঁজি করে যারা লাল সালু ডেগ বসায় তাদের অধিকাংশই দ্বীন ধর্মের ধার ধারে না। এদের অনেকেই জোর করে চাঁদা তুলে এ টাকায় নিজের পেট ভরে। এমনকি গাঁজা, চরস, আর রকমারী নেশায় এসব টাকা উড়ায়। অথচ 'আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– "যে ব্যক্তি আল্ল-হর আনুগত্যের কাজে মানত করে সে যেন তা পুরো করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্ল-হর নাফরমানিমূলক কাজে মানত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।" (বুখারী হাঃ ৬২২৯)

এছাড়াও হানাফী ফিকহ দুররে মুখতারে লিখা আছে : তুমি জেনে রাখ যে, অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে মৃত ব্যক্তিদের জন্য যে মানত করা হয় এবং ওয়ালীদের কবরে যে সব টাকা পয়সা এবং মোমবাতি ও তেল প্রভৃতি দেয়া হয়ে থাকে তাদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সে সব কাজ সবারই মতে বাতিল ও হারাম। (দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা; সূত্রে পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তফসীর– ২৭ পৃষ্ঠা)

তাই এসব অবৈধ কাজে টাকা পয়সা দেয়া বা কোনরূপ সহযোগিতা করা খুবই অন্যায় আর এগুলো উচ্ছেদের জন্য সকলকেই শান্তিপূর্ণ পন্থায় জোরালো প্রচেষ্টা চালানো দরকার, যাতে মানুষের ঈমান বিনষ্টের কারণগুলো সমাজ থেকে নির্মূল হয়ে যায়।

তিনটি স্থান ব্যতীত নেকীর উদ্দেশ্যে সফর নাজায়িয

সাধারণ মুসলিমদেরকে দেখা যায় নেকী বা কোন উদ্দেশ্য হাসিল অথবা পীর, ফাকীর, ওয়ালী বুযুর্গদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাদের কবর যিয়ারত করতে যান। যেমন, আজমীরে খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ), বাগদাদে আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ), সিলেটে শাহজালাল ও শাহপরান (রহঃ), খুলনায় খানজাহান আলী (রহঃ), চট্টগ্রামে বায়েজিদ বোস্তামী, ঢাকার হাইকোর্ট মাযার, গোলাপ শাহ মাযার ইত্যাদিতে যান। অথচ এ যিয়ারত বা সফর করা ইসলামী শারী'আতে নিষিদ্ধ। কেননা হাদীস শারীফে এসেছে– "তিনটি মাসজিদ ছাড়া কোন দিকে ভ্রমণ করো না, মাসজিদুল হারাম, আমার মাসজিদ অর্থাৎ মাদীনার নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদ এবং মাসজিদুল আক্বসা। (মুসলিম হাঃ ৩২৪৭)

যখন আমরা মাদীনাহ শারীফ যাওয়ার নিয়্যাত করি তখন যেন বলি, আমরা মাসজিদে নববীতে যাচ্ছি যিয়ারতের জন্য। তাই তিনটি মাসজিদ ব্যতীত নেকীর উদ্দেশ্য অন্য কোন মাসজিদ, মাযার বা স্থানে যাওয়া যাবে না, শারী'আত তা নিষেধ করেছে।

ক্ববর পূজার সমর্থনে জাল হাদীস

আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন ঃ ক্ববর পূজারীদের পথভ্রষ্ট হবার একটি কারণ এই যে, ঠাকুর তথা ক্ববর পূজারীগণ নানারূপ জাল হাদীস তৈরী করেছেন। সে সব জাল হাদীস হচ্ছে–

১। তোমরা যখন বিভিন্ন ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে যাবে তখন তোমরা ক্ববরবাসীদের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করবে।

২। বিভিন্ন ব্যাপার যখন তোমাদেরকে অপরাগ করে দেবে তখন তোমরা ক্ববরবাসীদের আঁকড়ে ধরবে।

৩। তোমাদের কেউ যদি কোন পাথরে সুধারণা পোষণ করে তাহলে তা তাকে অবশ্যই ফায়িদাহ দেবে। (বালাগুল মুবীন, উর্দু তারজামাহ– ৯১-৯২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) আরো বলেন ঃ এগুলো ছাড়াও আরো বহু হাদীস মাযার ও ক্ববর পূজারীরা মনগড়া তৈরী করেছে। অথচ ঐসব অজ্ঞ এটা বোঝে না যে, আল্ল-হ তা'আলা তাঁর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এজন্য পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি পাথর ও গাছ দ্বারা লাভ-লোকসান পাবার ধারণা পোষণকারীকে হত্যা করেন। তাই নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে নিজ উম্মাতকে ক্ববর পূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। (ঐ ৯২ পৃষ্ঠা) সূত্রঃ পাকা মাযার ও ওয়ালীদের তত্ত্বসার ঐ–৩৩ পৃঃ]

ক্ববরে বা মৃত ব্যক্তির নামে ক্বুরআন পড়া যাবে না

১। হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন ঃ ক্বুরআন পড়ে মজুরী গ্রহণকারী ও তা দানকারী দু'জনেই পাপী। ফলকথা, আমাদের যুগে ক্বুরআনের পারাগুলো মজুরি নিয়ে পড়ার যে প্রচলন ছড়িয়ে পড়েছে তা বৈধ নয়।

(বিনায়্যাহ শারহে হিদাইয়াহ ৩য় খণ্ড ৬৫৫ পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভিয়্যাত ২২৭ পৃষ্ঠা)

২। আল্লামা ইবনু আ-বিদীন হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ ঐরূপ করা কোন মাযহাবেই বৈধ নয়। ওর কোন সাওয়াবও পাওয়া যায় না।

(মাজমুআহ রাসায়িল ইবনু আ-বিদীন ১ম খণ্ড ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভিয়্যাত ২২৮ পৃষ্ঠা)

৩। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (রহঃ) বিভিন্ন ফাকীহদের বহু বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন, যেমন মজুরি নিয়ে ক্বুরআন পড়া এবং তাসবীহ (সুবহানাল্ল-হ) ও

তাহ্লীল (লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ) পড়া বাত্বিল কাজ। এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পায় না এবং পাঠকারীও পায় না। (মাজমূআহ্ ফাতাওয়া মাওলানা আব্দুল হাই ২য় খণ্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)

৪। হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে– মৃত ব্যক্তিদের জন্য ক্বুরআন পাঠ করার দা'ওয়াত গ্রহণ করা মাকরূহ এবং ক্বুরআন কিংবা সূরাহ্ আল-আনআম ও সূরাহ্ ইখলাস ইত্যাদি পাঠ করার জন্য সৎ লোক ও ক্বারীদেরকে সমবেত করা নিষিদ্ধ। (ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়্যাহ ৪র্থ খণ্ড, মিসর ছাপা; কিতাবুল হযরত ওয়ালইবা-হা ফাতাওয়া শা-মিয়াহ্ ১ম খণ্ড ৬০৪ পৃষ্ঠা) (সূত্রঃ পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার ৩৭, ৩৮ পৃষ্ঠা)

ওরসের নামে জঘন্য কর্মকাণ্ড

ওরস শব্দের অর্থ বাসর রাতের মিলন (আল ক্বামূস ২য় খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)। ওলীমার খানা ও খুশী প্রভৃতি। (মিসবাহুল লুগাত– ৫২০ পৃষ্ঠা)

কিছু লোকের পরিভাষায় ওরস বলা হয় কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মাযারে তাঁর মৃত্যু দিবস পালনের নামে ধর্মীয় জালসার আয়োজন করা এবং তাঁর ভক্ত জনগণের ভিড় অর্থাৎ একটি মেলার রূপ ধারণ করা। আল-ক্বুরআনের কোথাও ওরস শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু হাদীসে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বাসর রাতের মিলন অর্থে। যেমন বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বর্ণনায় রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ববরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মালাইকার (ফেরেশতার) মুখ দিয়ে নেক্কার লোকদেরকে বলেন, নাম কানাওমাতিল আরুস অর্থাৎ তুমি বাসর রাতের বর-কনের ঘুমের মত ঘুমাও। (তিরমিযী, মিশকাত ২৫ পৃষ্ঠা)

মহানাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর সময় তাঁর সহাবায়ি কিরাম ছিলেন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার। (উলূমুল হাদীস ২৬৮ পৃষ্ঠা)

ঐসব মাননীয় সহাবীগণের মৃত্যুর নাম করে কোন রকমই ওরস পালন করা হয় না।

তাবি-তাবিঈনদের পরবর্তী যুগে মুসলিমরা যখন ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায় তখন তাদের সাহচর্যে অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে কিছু মুশরিকী ধ্যান ধারণা ও কার্যাবলী স্থান পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রূপ শির্কের প্রচলন রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, আল্ল-হর নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ববরে, অন্যান্য সহাবা (রাযিঃ)-এর ক্ববরস্থানে বা অন্য কোথাও, তাঁদের নামে ওরস বা ইসালে সওয়াবের অনুষ্ঠানাদি হতে দেখা যায় না। এমনকি আল্ল-হর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস উদযাপনের কোন নির্দেশ দেননি। তাই সহাবী (রাযিঃ)গণও তার প্রচলন করে যাননি। অথচ একদল লোক পীর মুর্শিদের মাযারে এবং অন্যত্র ওরস এবং ইসালে সাওয়াব প্রভৃতির অনুষ্ঠানাদি করে যাচ্ছে। রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুবার্ষিকীর নামে কোন ওরস কখনই পালন করা হয়

না। মহানাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে মুসলিমদের কাছে অতিভক্তির পাত্র তাঁর চারজন মহামান্য খালীফাহ্ তাঁরা হলেন আবূ বাক্বর সিদ্দীক্ব, 'উমার ফারূক্ব, 'উসমান গনী ও 'আলী (রাযিঃ)। এঁদের কারো নামেও ওরস পালন করা হয় না। আর করাটাও হবে বিদ'আত ও হারাম।

ওরস নামীয় মেলার অনুষ্ঠানাদিতে ভক্তরা অজস্র অর্থ ব্যয়ে বহু সংখ্যক গরু, ছাগল, মহিষ যবেহ্ করে ও শিরনী তৈরী করে। আর সব ভক্তরা মিলে সেগুলো তাবাররুক হিসেবে খায় ও বিতরণ করে। কোন কোন ভক্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করে নিঃস্ব পর্যন্ত হয়ে যায় এ ধারণায় যে, সে বেশি অর্থ ব্যয় করে পীর বাবার বেশি রেজামন্দি হাসিল করছেন। এসব অনুষ্ঠানে কোথাও কোথাও গান বাজনা করতে করতে বেগানা স্ত্রী-পুরুষ এক সাথে স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর এমন অজ্ঞান হলেও স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক সম্পর্ক হয়ে গেলেও তাকে তারা গুনাহর কাজ মনে করে না। নাউযুবিল্লাহ। (সূত্রঃ পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার ঐ ৯-১১ পৃষ্ঠা)

নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্বরর পাকা করার কারণ

হিজরীর ষষ্ঠ শতকে মিশরে এক তাহাজ্জুদগুজার দীনদার ও পরহেযগার বাদশাহ্ ছিলেন। আলৃআ-দিল নূরুদ্দিন শহীদ (রহঃ) ৫৫৭ হিজরীতে একরাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখেন। নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লাল-হলুদ বর্ণের দু'জন লোকের প্রতি ইশারাহ করে বলছেন, এদের দু'জনের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর। ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় বিচলিত অবস্থায়। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং সলাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি হুবহু ঐ স্বপ্নই দেখলেন এবং জেগে উঠলেন। আবার তিনি সলাত আদায় করলেন এবং শুয়ে গেলেন। তারপরও তৃতীয়বার তিনি ঐ স্বপ্নই দেখলেন এবং জেগে উঠলেন। এরপর আর তার ঘুম এলো না। তাঁর এক মন্ত্রীও ছিলেন নেক প্রকৃতির। যাঁর নাম ছিল জামালুদ্দীন মূসিলী। তাই তিনি মন্ত্রীকে ঐ রাতেই ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনালেন। এবার মন্ত্রী বললেন, তাহলে আপনি এখনো বসে কেন? এখনই চলুন মাদীনায়। আর আপনি যা দেখেছেন তা গোপন রাখুন।

তারপর বাদশাহ বহু মালধনসহ তাঁর ওযীর এবং বিশজন আরোহীকে সঙ্গে নিয়ে মাদীনার দিকে পাড়ি দিলেন। অতঃপর ষোলদিনে তাঁরা মাদীনায় পৌঁছে গেলেন। তারপর বাদশাহ গোসল করলেন এবং মাসজিদে নাবাবীতে ঢুকে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর মাদীনাহবাসীকে দান-খাইরাত দেবার কথা ঘোষণা করলেন। যাতে ঐ লোক দু'টিকে ধরা যায়। বাদশাহর ঘোষণা শুনে বহু লোক এল এবং বাদশাহর হাত থেকে দান ও হাদিয়া নিয়ে গেল। পরিশেষে যখন লোক আসা বন্ধ হল তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ বাকী আছে কী? লোকেরা বলল, দু'জন পশ্চিমী ব্যক্তি ছাড়া কেউ বাকি নেই। কিন্তু ওরা তো কারো কাছ থেকে কিছু নেয় না এবং ওরা খুবই সাধু পুরুষ ও ধনী। যারা নিজেরাই দান করে বিভিন্ন

প্রয়োজনে। কথাগুলো শুনে বাদশাহর মন খুশী হল। তিনি বললেন, ঐ দু'জনকে আমার নিকট আন। ফলে ওদেরকে আনা হল। বাদশাহ দেখলেন যে, এরাই সেই দু'জন যাদের প্রতি নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছিলেন এ বলে যে, এদের দু'জন থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

বাদশাহ বললেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল, পশ্চিম দেশের। আমরা হাজ্জ করতে এসেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পড়শী হতে পছন্দ করলাম। এবার বাদশাহ বললেন, আপনাদের থাকার জায়গা কোথায়? তারা বলল, নাবীজীর ক্ববরের নিকটবর্তী সীমান্তে। অতঃপর বাদশাহ তাদেরকে আটক রেখে নিজে তাদের থাকার জায়গায় হাজির হলেন। সেখানে তিনি অনেক মালধন ও সীলমোহর এবং হৃদয়-গলানো কিছু গ্রন্থ দেখতে পেলেন। এছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না। তদুপরি মাদীনার বাসিন্দারা তাদের দু'জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, এঁরা দু'জন আজীবন সীয়াম পালনকারী (রোযাদার) এবং নাবীজীর রওযার মধ্যে সলাতের (নামাযের) খুবই পাবন্দ। আর এরা প্রত্যেক দিন সকালে নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এবং বাক্বীউল গরক্বদ (জান্নাতুল বাক্বীর) ক্ববর যিয়ারত করেন এবং প্রত্যেক শনিবারে কুবায় যিয়ারত করেন। এরা কোন প্রার্থনাকারীকে কখনও ফিরায় না। এ বছর দুর্ভিক্ষের সময় এরা মাদীনাহবাসীদের অভাব মোচন করেছেন।

তারপর বাদশাহ তাদের ঘরটা অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং একটি চাটাই তুললেন। অতঃপর নাবীজীর ক্ববর মুবারকের দিকে ধাবিত একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেলেন। ফলে সমস্ত লোকই কেঁপে উঠল। তারপর বাদশাহ বললেন, এখনো তোমরা তোমাদের সত্য কথাটা বলো। অতঃপর তাদেরকে খুব পিটানো হল। মারের চোটে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, তারা আসলে খৃষ্টান। তারা নাবী সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লাশ সরাতে এসেছে। রাতে তারা মাটি খুঁড়তো এবং পশ্চিমবাসীদের মত তারা চামড়ার জুব্বা পরতো। ঐ জুব্বার মধ্যে তারা মাটিগুলো নিয়ে বাক্বীউল গরক্বদ (জান্নাতুল বাক্বী) যিয়ারত করার ভান করে বিভিন্ন ক্ববরে তা ছড়িয়ে দিত। অতঃপর তারা যখন নাবীজীর হুজরার নিকটবর্তী পৌঁছে যায় তখন আকাশ গর্জন করে এবং বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। আর একটা বিরাট কম্পন হয় যদ্বারা মনে হয় যে, ঐ সব পাহাড়গুলো যেন উৎপাটিত হল। ঐদিন ভোরেই বাদশাহ মাদীনায় পৌঁছেন এবং তাদেরকে ধরে ফেলেন। কোন উপায় না দেখে তারা খুবই কাঁদতে থাকে। অতঃপর বাদশাহর নির্দেশে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। ঐ দু'জন ছিল স্পেনের বাসিন্দা।

তারপর বাদশাহ প্রচুর সিসা আনালেন এবং নাবীজীর হুজরার চারিদিকে পাতালের পানি পর্যন্ত গভীর গর্ত খোঁড়ালেন। অতঃপর সিসাগুলো গলিয়ে ঐ গর্তগুলোতে ভরে দিলেন। ফলে নাবী সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ক্ববরের চতুর্দিকে সীসার দেওয়ালে পরিণত হল।

(ওয়াফাউল-ওয়াফা ১ম খণ্ড ৪৬৬-৪৬৮ পৃঃ আদদুরার সানিয়্যাহ্ ফিল আজবিবাতিন নাজদিয়্যাহ্ ২য় খণ্ড ৪০১পৃঃ)

এভাবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরিস্থিতির তাকীদে প্রিয়নাবী সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুরো কুবরটা নয় কেবল এর চতুর্পার্শ্বটা অগত্যায় পাকা করতে হয়। (সূত্রঃ ঈদুল হাক্ব ২২পৃষ্ঠা, পাকা মাযার ও ওয়াসীলার তত্ত্বসার– ১১৩-১১৭ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কুবরে সবুজ গম্বুজ

আল্লামা সামহূদী বলেন, নাবী সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াফাতের (মৃত্যুর) পর থেকে প্রায় সাতশ বছর ধরে তাঁর কুবরে কোন পাকা ইমারত ছিল না। তারপর ৬৭৮ হিজরীতে (মিশরের বাদশাহ) মানসূর ইবনু কাল্লাদুন স্ব-লিহী কামাল আহমাদ ইবনু বুরহান আব্দুল কাভীর পরামর্শে কাঠের একটি গম্বুজের মত তৈরী করেন এবং সেটাকে 'আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর হুজরার ছাদের উপর লাগিয়ে দেন। ওটাই কুব্বায়ে যুররাক্ব বা সবুজ গম্বুজ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সে যুগের 'আলিমগণ কোনভাবে ঐ কাজ করা থেকে বাদশাহকে বাঁধা দিতে পারেননি। তবে তাঁরা ওটাকে খুবই জঘন্য কাজ ভাবেন। অতঃপর ঐ কাজের পরামর্শদাতা পূর্বোক্ত কামাল আহমাদ যখন গদিচ্যুত হন তখন লোকেরা তার ঐ গদিচ্যুতিকে আল্ল-হর পক্ষ থেকে তার উক্ত জঘন্য কাজের শাস্তি হিসেবে গণ্য করেন। তারপর আল মালিকুন না-সির হাসান মুহাম্মাদ কাল্লাদুন এবং তাঁর পরে ৭৬৫ হিজরীতে আলমালিকুল আশরাফ শা'বান ইবনু হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ওতে সংযোজনী নির্মাণ কার্য করেন। এভাবে বর্তমান নির্মাণ পর্যন্ত কাজ হয়। (ওয়াফাউল ওয়াফা– ৪৩৫-৪৩৬ পৃষ্ঠা)

তারপর নাবীজীর কুবরটাকে নয়নাভিরাম লোহার জাল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে এবং সেখানে পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। যাতে শারী'আত বিরোধী কোন কাজই তারা সেখানে কাউকেই করতে না দেন। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুবরে পুলিশ মোতায়েন করা এবং শারী'আত বিরোধী কাজ হতে না দেয়ার জন্য বর্তমান সউদী সরকার কৃতজ্ঞতার অধিকারী। কিন্তু এতটা কাজই যথেষ্ট নয়, বরং ঐ সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য হল, রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাসজিদকে ওর আগেকার অবস্থান ফিরিয়ে আনা। অর্থাৎ মাসজিদে নাবাবী এবং কুবরে নাবাবীর মাসজিদ থেকে আলাদা করে দেয়া। যাতে করে মাসজিদে নাবাবীতে প্রবেশকারীগণ ওর মধ্যে শারী'আত বিরোধী এমন কিছু দেখতে না পান যা নাবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপছন্দ ছিল। তা হল এই যে, কোন মাসজিদের মধ্যে কোন কুবর যেন না থাকে। এরূপ কার্য সম্পাদনকারীকে তিনি লা'নাত ও অভিসম্পাত দিয়েছেন। সাউদী হুকুমাত যদি সত্যিকারভাবে তাওহীদ তথা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সংকল্প রাখেন তাহলে তাঁদের এ প্রস্তাব মুতাবিক কাজ করা একান্ত কর্তব্য। আমি আশা করি যে, আল্ল-হ তা'আলা সউদী হুকুমাত দ্বারা এ কাজটা করিয়ে নেবেন। সউদী হুকুমাতের চেয়ে এ কাজের বেশী দায়িত্বশীল ও যোগ্য আর কে হতে পারে? (কাবরু শার মাসাজিদ তা'মীর ৬৮ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুবর সম্বলিত আয়িশাহ (রাযিঃ) এর হুজরাটি চারদিক দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছিল। যার ছাদটা কুবরে নাববীর আগেই মওজুদ ছিল। তারপর এক বিদ'আতী বাদশাহর বিদ'আতী ধ্যানধারণার ভিত্তিতে ওর ছাদের উপরে গম্বুজ তৈরী করা হয়েছিল। যা স্বয়ং রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে বর্ণিত হাদীস অনুসারে মনগড়া তথা ইসলাম বিরোধী কাজ। (সূত্রঃ পাকা মাযার ও বিভিন্ন পাপাচার- ১১৭-১১৯ পৃষ্ঠা) রসূলুল্ল-হ সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুবর অগত্যায় পাকা করার দোহাই দিয়ে যে কোন কুবরকে পাকা মাযারে পরিণত করা যাবে না। যেমন বর্তমানে হচ্ছে। আল্ল-হ আমাদের বুঝার তাওফিক দিন- আমীন।

আহ্বান!

পীর ফাকীরদের স্বরূপ উন্মোচন এবং কুবর পূজাসহ এসব কর্মকাণ্ডের ভয়াবহ পরিণতি অবহিত হওয়ার পর যারা এখনও এই পথে রয়েছে, তাদের উচিত অতিসত্বর আল্ল-হর নিকট তাওবাহ করা। এসব শির্কী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে এসে তাওহীদের উপর এবং রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ সুন্নাতের উপর সর্বাবস্থায় অটল থাকার অঙ্গীকার করে মহান গাফূরুর রহীম আল্ল-হর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। অন্যথায় দুন্ইয়া ও আখিরাতে কঠোর ও ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি থেকে বাঁচার কোন পথই থাকবে না। তাই আসুন সকল কাজে একমাত্র আল্ল-হর উপরই নির্ভর করি। সকল অবস্থায় ও সব বিষয়েই তার কাছেই একমাত্র সাহায্য চাই এবং শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির পথেই চলি। আল্ল-হ আমাদের সেই তাওফীক দিন- আমীন। আল্ল-হ আমাদেরকে শির্ক থেকে মুক্ত করে দুনইয়া ও আখিরাতকে সুখময় করে তুলুন- আমীন।

শির্ক থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا اَعْلَمُهٗ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهٗ.

অর্থাৎ- "হে আল্ল-হ! নিশ্চয়ই আমি জেনে শুনে তোমার সঙ্গে শারীক করা হতে পরিত্রাণ চাই এবং অজ্ঞাত অবস্থায় যা করে ফেলি তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (সহীহুল জামি সাগীর- ৩/২৩৩)